ইছাপুরের মুখপত্র

ইছাপুর বার্তা

(সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাময়িকী)

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

আত্মপ্রকাশ ও শারদীয়া সংখ্যা ২০১৭ (১৪২৪)

সম্পাদক — বিপ্লব ঘোষ

ইছাপুর বার্তা

(সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

আত্মপ্রকাশ ও শারদীয়া সংখ্যা ২০১৭ (১৪২৪)

পত্রিকা পরিচালন সমিতি

৬। প্রকাশনা — দীপান্বিতা প্রকাশনী, ইছাপুর গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা।

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

গ্রাম - ইছাপুর, ডাকঘর - গোবরডাঙা - ইছাপুর,

থানা - গাইঘাটা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৫২,

চলভাষ - ৯০৯৩৬১৩১৭৫

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ কুশদহ পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ (১৩২১ বঙ্গাব্দ) এর একটি সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত। ইছাপুর গোবরডাঙার মানচিত্র।

বিনিময় মূল্য ঃ ৫০টাকা

ইছাপুর বার্তা

আত্মপ্রকাশ ও শারদীয়া সংখ্যা

বিষয়সূচি

> আমাদের ইতিহাসকে আমরা অপরের হাত হইতে উদ্ধার করিব .... এখানে তাহারা যদি নিজের চেষ্টায় ভ্রমও সংগ্রহ করেন, সেও পর লিখিত বিদ্যা হইতে অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ।
>
> — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয়

বৃহত্তর ইছাপুর অঞ্চলের মানুষের কথা বলার উদ্দেশে পথচলা শুরু হল ইছাপুর বার্তা (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাময়িকী)। প্রাচীন ঐতিহ্যবিজড়িত ও ইতিহাসসমৃদ্ধ ইছাপুর নিয়ে কোনও পত্রিকার প্রকাশনা ভাবনা এই প্রথম। আশা করি এতদ্অঞ্চলের মানুষের সদিচ্ছা ও সহযোগিতায় এই পত্রিকার যাত্রাপথ সুগম ও সুদৃঢ় থাকবে। শারদীয়ার এই আনন্দঘন মুহূর্তে আপনাদের হাতে পত্রিকার 'আত্মপ্রকাশ' সংখ্যা তুলে দিতে পেরে সন্তোষ বোধ করছি।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত 'ইছাপুর' নামক এই গ্রাম পাঁচশত বছরেরও প্রাচীন সমৃদ্ধ এক জনপদ। প্রাচীন কুশদ্বীপ পরগনার জমিদারির প্রধানকেন্দ্র ও জনপদ ছিল এই ইছাপুর। জমিদার রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ইছাপুরকে অমরাবতীর মতো সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, যার কিছুটা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন তাঁর উত্তরসূরীরা। কিন্তু, সেইসব নিদর্শনের কিছুই আজ আর নেই, কালের স্রোতে সবই আজ বিলীন। ধ্বংস হতে হতেও কোনক্রমে জীর্ণ নবরত্ন (দোলখোলা গোপালদেবের মন্দির) মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের চাকায় ইছাপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যও বিলীন।

গ্রামীণ সম্পদে ঘেরা ইছাপুরের আধুনিক নবরূপায়ণ আমাদের সকলের লক্ষ্য। এলাকার ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজের মধ্যে সাহিত্যবোধ, সমাজউন্নয়ন ভাবনা, এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে বহু কাজ করার আছে। একটি পত্রিকা হতে পারে সেই 'প্লাটফর্ম', যার মাধ্যমে নতুন চিন্তা-আদর্শের ভাবনা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। পত্রিকার লেখালেখির মধ্যে দিয়ে সেই নব্যভাবনার উদ্যমী চিন্তা-চেতনা আমরা প্রসারিত করতে চাই।

নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, বহুজনের সহযোগিতা ও পরামর্শে আমরা এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশে সমর্থ হয়েছি। আশা করছি, আগামী দিনেও এই পথ চলা মসৃণ ও আনন্দপূর্ণ হবে সকলের সানন্দ সহযোগিতায়। লেখা পাঠান, চিঠি দিন, পত্রিকার যৌক্তিক উন্নতিতে আমরা আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। সাহিত্য-সমাজ উন্নয়ন ভাবনা শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজন নির্ভর আলোচনাচক্র ও কর্মশালা গড়ে তোলার ভাবনাও আছে। ইছাপুর হোক আধুনিক প্রগতিশীলতার নবরূপায়ণের অগ্রপথিক। ইছাপুর গ্রামের জল-মাটি-জীবন আমাদের প্রাণের শিকড়। গ্রামের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি হোক আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বামী আত্মস্থানন্দজী : একটি মহৎপ্রাণ

ভুবন রায়সরস্বতী

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যদের বলতেন — "তোরা খাটতে খাটতে মরে যা" তাঁর নিজেরও মৃত্যু হয়েছিল অকালে, খাটতে খাটতে দুরারোগ্য ব্যধিতে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চদশ অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজীও একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। তিনিও খাটতে খাটতে চলে গেলেন 'অমৃতলোকে'। মৃত্যুকালে তাঁর নশ্বর বয়স ৯৮ বছর পেরিয়ে যায়। জীবনের শেষ বছরটি কাটে রোগভোগের মধ্য দিয়ে বেলুড় মঠ পরিচালিত কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। হাওড়ার বেলুড়মঠ প্রাঙ্গণে নবনির্মিত প্রেসিডেন্ট আবাসে তিনি ছিলেন মাত্র তিনমাস। জীবিত অবস্থায় তাঁর আর মঠে ফেরা হয়নি। হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ এল ৮ই জুন ২০১৭, রবিবার, রাত্রি প্রায় ১০ টায়। রবিবার রাত্রি থেকে সোমবার রাত্রি পৌনে দশটা পর্যন্ত তাঁর মরদেহ রাখা হল বেলুড় মঠের সংস্কৃতিক কেন্দ্র ঠাকুর - মা স্বামীজীর প্রতিকৃতির সামনে। প্রায় দেড়দিন ধরে দিবারাত্র ভক্তরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানান। বৃষ্টির মধ্যেও ভক্তরা তাঁকে শ্বেতপদ্ম ও ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অবশেষে সোমবার রাত্রি পৌনে দশটায় যথোপচারে চন্দন কাঠের শয্যায় তাঁকে শায়িত করে তাঁর নশ্বর দেহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। একটি কর্মময় মহাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

প্রসঙ্গত বলা যায় — এই প্রথম কোনও সন্ন্যাসীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টি করা হল। রাজ্য সরকারের ইচ্ছায় হাওড়া সিটি পুলিশের জওয়ানরা গান স্যালুটের মাধ্যমে এই মহান কর্মবীর সেবাব্রতী সন্ন্যাসীকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তখন বেলুড় মঠের অন্ত্যেষ্টি স্থলে তাঁকে ছুঁয়ে ছিলেন মঠের প্রায় সমস্ত প্রবীণ সন্ন্যাসীরা। এই ঘটনা রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসের পাতায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

স্বামী আত্মস্থানন্দের আসল নাম সত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। জন্ম তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের সাবাজপুরে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মে। কলেজ জীবন থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক পথের পথিক। তখনই তিনি যুক্ত হন দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। পরে তিনি বেলুড়মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ বেলুড় মঠের দশম প্রেসিডেন্ট স্বামী বিরজানন্দের কাছে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তার সন্ন্যাস নাম স্বামী আত্মস্থানন্দ। আমাদের গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালে। প্রথম থেকেই আমি ছিলাম এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। নানা কাজে বিশেষ করে স্মারক পুস্তিকার জন্য আশীর্বাণী ও অন্য কোন নতুন কাজের সূচনা লগ্নে তাঁর কাছে আমরা যেতাম তাঁর অমূল্য আশীর্বাণী গ্রহণের জন্য। তখন তিনি বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক। যেমন ছিলেন তিনি গুরু গম্ভীর তেমনি অত্যন্ত দিলখোলা। আমাদের কোনও ত্রুটি দেখলে তা ধরিয়ে দিতেন আবার প্রাণভরে আশীর্বাদও করতেন। তাঁর গাম্ভীর্যের আড়ালে থাকতো একটা স্নেহের আবরণ।

পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য স্বামী আত্মস্থানন্দ প্রথম থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের মূলমন্ত্র। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই আদর্শে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর জীবন পথের পাথেয় ছিল স্বামীজির সেই বাণী — 'তোরা অন্যের জন্য খাটতে খাটতে মরে যা'। বাস্তবিকভাবেই

এই ভাবাদর্শে বিশ্বাসী আত্মস্থানন্দজি সারাজীবন এই সেবাব্রতের ধারক ও বাহক ছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের জীবন বাণীই ছিল তাঁর জীবনব্রত। তিনি শুধু যে হাজার হাজার ভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাদের জীবনকে সার্থক করেছেন তাই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের যে জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাকে আত্মস্থানন্দজি নিজের জীবনের সঙ্গেও একীভূত করেছিলেন। তাঁর পরম ইচ্ছা ছিল তিনটি বড়ো কাজ করার — এক : একটি বড়ো হাসপাতাল গড়ে তোলা — যেখানে মুমূর্ষু রোগীরা সেবা পাবে। দুই : শ্রীরামকৃষ্ণের একটা বিরাট বিশ্বজননী মন্দির প্রতিষ্ঠা করার যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ আলোচনা, ধ্যান ও ভজন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে। আর তৃতীয় : জগতের মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সকলকে রামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করা। এই তিনটি অভীষ্ট তাঁর সিদ্ধ হয়েছিল। অন্যান্য কাজের মধ্যে এই তিনটি কাজও তিনি করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর একটি দুঃখও ছিল। তিনি রেঙ্গুনে থাকতে যে বিরাট হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন সেটি সে দেশের সরকারের হাতে সমর্পণ করে তিনি বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

স্বামী আত্মস্থানন্দজি ১৯৭৬-৭৭ সালে তৎকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দের একান্ত আগ্রহে ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দজির মধ্যস্থতায় বেলুড় মঠে চলে আসেন। তখন তিনি ছিলেন রাজকোটে, সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান হিসাবে। সেখানে থাকাকালীন আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাসে মাসে আশ্রমে আসতেন এবং খুব সম্ভব এখানেই মোদীজি স্বামী আত্মস্থানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আত্মস্থানন্দজির দীক্ষাগুরু ছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। বিজ্ঞানানন্দ বর্তমানে বেলুড় মঠের স্থপতিও। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা মত তিনিই বেলুড় মঠের রূপদান করেছেন।

স্বামী আত্মস্থানন্দজি ২০০৭ সালে মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন যথার্থই কর্মবীর ও সেবাব্রতী। ঠিক যেমনটি স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন। অনেক সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে ঠাট্টা করে 'বীর' বলে ডাকতেন। স্বামীজি তাঁর নিজ শিষ্যদের বলতেন তোরাও বীর-ই। অর্থাৎ বীরের মত কাজ কর। ''খাটিতে খাটিতে মরে যা''। স্বামী আত্মস্থানন্দজীও ছিলেন প্রকৃতই বীর। তাঁর জীবন ও মৃত্যু আমাদের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে। 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ''।

(লেখক গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক)

'বাংলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালি বাঁচিবে না। বাংলার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। যে দরিদ্র সে সোনারূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না . . .'

— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'ইতিহাসচর্চা আত্মচর্চারই অঙ্গ। ইতিহাস সন্ধান তাই আত্মানুসন্ধান।'

— ভিনসেন্ট স্মিথ

অধ্যাপক তারকমোহন দাস — অনন্য বিজ্ঞান লেখক ও প্রচারক

দীপককুমার দাঁ

১৯৭০ - ২০১৫, এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের জনবিজ্ঞানচর্চা পরিবেশ আন্দোলনমূলক কাজকর্মে তিনি ছিলেন একজন অগ্রজ-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। যে সব আকরগুণে তিনি অভিষিক্ত ছিলেন —

১) প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, অনীশ দর্শনচর্চায় নিবেদিত।

২) স্পষ্ট বক্তা। যাবতীয় কাজকর্মে পরিশীলিত — অধ্যবসায়ী মননির্ভর। কথায়-কাজে বিদ্যাসাগরীয় ঘরানায় আশ্রিত।

৩) পরিবেশচর্চা ও আন্দোলন; জীবনবিজ্ঞান পঠনপাঠন ভাবনার প্রচার-প্রসার-গ্রন্থনির্মাণ; বিবিধ VCD, DVD ~~ব্যবস্থায়~~ আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠ পঠনপাঠনে এক নতুন দিশার সূচনাকারী।

৪) উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণ — এই দুটির পারস্পরিক ঘাত-অভিঘাত, সংঘর্ষ-সঙ্কট নিয়ে তিনি প্রচুর লেখালেখি, স্লাইড বক্তৃতা ও প্রচারমূলক কাজ করেছেনএকক উদ্যমে, অনিঃশেষ ক্লান্তিহীনতায়।

৫) জনবোধ্য (Popular Science) বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখির ক্ষেত্রে তিনি একটি নতুন ধারার প্রবর্তক। ছবি, সারণি ও অত্যাধুনিক তথ্যের সু-সমৃদ্ধ সমাবেশে পাঠক-মনন তৈরিতে যেমন পরিশ্রমী, তেমনি দায়বদ্ধতায় জীবনের শেষদিন অবধি (৯৩ বছর জীবন-কর্ম) ছিলেন কঠিন ব্রত সাধনের নীরব সংকল্পে আপোষহীন। তাঁর প্রতিটা গ্রন্থ বহু সংস্করণে রেকর্ড সৃষ্টিকারী।

৬) সর্বোপরি, আদর্শ শিক্ষক, ছাত্রদরদি ও সাহায্যমনা। টেলিফোনে কখনও বিরক্ত হতেন না। বহুবার বাড়িতে গিয়েছি। সবরকম সাহায্য পেয়েছি অকপট আন্তরিকতায়।

পরিণত বয়সেই চলে গেলেন (২৩-০৩-২০১৭)। বছর ২০ প্রায় আগে নিজের বাড়িতেই গড়ে তোলেন Prof. T.M. Das foundation। এই প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটফর্মে নিজ ব্যয়ে তিনি বহু কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে একক প্রয়াসে সংগঠিত করেছেন। আজ তাঁর বাড়ি-সমস্ত সম্পত্তি রেজিস্টার্ড ট্রাস্টির হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে আমেরিকায় থাকেন। অল্প কিছুদিন আগে স্ত্রী মারা গেছেন। নিঃসঙ্গ হলেও একাকিত্ব ছিল না। হাজারো কাজের ভাবনায় ডুবে থাকতেন গঠনমূলক মনোভাবের নিরিখে। একজীবনে তিনি যে বিপুল কাজের নজির রেখে গেছেন, তা এই সময়কালের বিবেচনায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

জন্ম ১ মার্চ ১৯২৪। জীবন কেটেছে ২৩ কার্ল মার্কস সরণি, খিদিরপুর, কল-২৩। ক.বি.-এর উদ্ভিদবিদ্যায় এম এসসি। পিএইচ ডি - লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩)। খ্যাতনামা অধ্যাপক F.G.Gregory, FRS - এর কাছে। বিষয় - উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা। (Plant Hormones in vernalized embryo and extension growth of ryecrop under photoperiodic treatment)। দেশে ফিরে তিনি ক.বি. - এ উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে গবেষক ছাত্র হিসাবে যোগ দেন, পরে অধ্যাপনায় কৃষি বিভাগে, যা ১৯৫৪-তে প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক প্রবোধকুমার সেনের ব্যবস্থাপনায়। ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি আমেরিকায় অধ্যাপক A C Leopold, পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টোরাল গবেষণায় যোগ দেন। পরে, ১৯৬৩-৬৪ সালে উইসকনসিন

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক A C Hilderbrandt - এর কাছে। বিষয় - On the dynamic activities in isolated single cells of Tobaco with cine-photo micrographic technique – a work which for the first time revealed that, (1) the opening and closing of nucleolar vacuole in a cell would facilitate the transport the DNA macromolecule from nucleus to the cytoplasm, (2) in a mitotic cell division, two sets of chromosomes never moved to the opposite poles but organized themselves into two daughter nuclei in the central area of the cell opparently from the metirials or the dissolved mother nucleus ....' (দ্রষ্টব্য - Preface by Prof. R.N. Basu of the book - Prof. T M Das Commemoration volume, Indian Biologist, Vol.38, 2006)

ক.বি.-এ অধ্যাপনা ও বিবিধ কাজের সূত্রে প্রায় ৫১ বছর ঘনিষ্ঠভাবে (১৯৮৯) যুক্ত থেকেছেন। সারা জীবনের বিজ্ঞান গবেষণা কাজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে — (১) উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা — এর মধ্যে আছে growth hormones, vernalization, photo periodism, stress physiology .... ইত্যাদি। (২) Cell Biology – tissue and single cell culture, cryobiology .... ইত্যাদি। (৩) পরিবেশ গবেষণা — উদ্ভিদ জগৎ ও দূষণ সঙ্কট, উদ্ভিদের যথার্থ মূল্য, ... ইত্যাদি। একটি গাছের যথার্থ পরিবেশ মূল্য উনি দীর্ঘ গবেষণায় নির্ধারণ করেন ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। তিনি দেখান, গাছ যে পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন করে, তার বাজার অর্থমূল্য, ভূমিক্ষয় রোধ, বায়ুমণ্ডলে জল সিঞ্চন (বাষ্পায়ন, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের জীবনধারণ, CO_2 আত্তীকরণ ও গ্রীনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা — এইসব কিছুর মিলিত ভূমিকা একত্রিত করলে ৫০ বছর বয়সী একটি গাছের অর্থমূল্য ওই রকম দাঁড়ায়। বর্তমানের বাজার দরে, এই পরিমাণ ৩ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই গবেষণা দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত।

১৯৮০ সালে গোবরডাঙা জেনেসীস ইনসটিটিউটের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম মৌমাছি পালন সম্মেলন অনুষ্ঠিত করি। স্যার ছিলেন এর উদ্বোধক। এর প্রায় একবছর আগে থেকে ওঁর কাছে আমার যাতায়াত। কম বেশি শেষ দিন অবধি ওঁর সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ভীষণ উৎসাহ দিতেন। ১৯৮২ সালে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত করি বাংলা বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন। বিষয়টি খুবই প্রশংসা পায়। স্যার ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ক.বি.-এ স্যারের ঘরে প্রথম প.ব. বিজ্ঞান লেখক সমিতি গঠিত হয়। গুছিয়ে গঠনমূলক মনোবৃত্তিতে গোটাজীবনে তিনি বহু কাজ করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ের বিজ্ঞান লেখক হিসাবে তাঁর ভূমিকা অনবদ্য। বাংলায় উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ — 'আমার ঘরের আশেপাশে'। সহজ উদাহরণে চিত্তাকর্ষক ভাবে পাঠক মনে প্রশ্ন ও আগ্রহ জাগিয়ে তাঁর কলম এগিয়ে যেত। গাঁজাখুরি অবৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি — রহস্য রোমাঞ্চ নির্ভর কোন রচনা তিনি লেখেননি। ওঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ — 'পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য?' (১৯৭৮) — একটি ক্ল্যাসিক বিজ্ঞান গ্রন্থ। ৫টি সংস্করণ হয়েছে। বর্তমানের অনেক বিজ্ঞান লেখক ওঁর রচনাশৈলীর অনুসরণে প্রাণিত। প্রতিভা যখন নিবেদিত ডেডিকেশনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কার্য সম্পাদন করে, তখন তার আলাদা মূল্য তৈরি হয়। এই বইটি খুব ভালোভাবে পড়লে যা নজরে আসে - প্রচুর তথ্য সুচারু বিন্যাসে সুসংবদ্ধ। অনেক নতুন ভাবনা বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের আঙিনায় তিনি প্রথম সংযোজন করেছেন। বাংলা ভাষায়

পরিবেশ আন্দোলন - ভাবনাচিন্তা প্রসারের তিনি অগ্রপথিক — চিন্তক ও দার্শনিক।

তাঁর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ — 'মানুষ একটি বিপন্ন প্রজাতি'। এই বইটিও সময়ের নিরিখে যথেষ্ট এগিয়ে থাকা একটি সতর্ক বাণী পৌঁছে দিয়েছিল বাঙালি বিজ্ঞান-চিন্তকদের ভাবনায়। পরিবেশ সঙ্কটের বিবিধ ভাবনার নিরিখে সামাজিক সংঘাত — অর্থনৈতিক সমস্যা — রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি হাজির করেছেন একটি নতুন সমাজ মূল্যায়ণ - যা ভেবে দেখতে বাধ্য করে, আমরা কোথায়? কীভাবে রয়েছি?

'পরিবেশ প্রসঙ্গ' বইটি কলেজস্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য হলেও এটিও পরিবেশ ভাবনা শিক্ষার একটি মূল্যবান ব্যবহারিক গ্রন্থ। 'জীবন ও পরিবেশ' — তাঁর স্বকীয় পরিবেশ চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল বিশেষ।

সুপাঠ্য-জনবোধ্য বিজ্ঞান গ্রন্থ অনেকেই লিখেছেন। যে বিশিষ্টতায় তিনি একক ও অনন্য — তা হোল ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় উন্নয়নের প্রধান সঙ্কট মাত্রাতিরিক্ত জন বিস্ফোরণ। কম বেশি ৫০ বছর সময়কাল ধরে এই ব্যাপারে তিনি দ্বিধাহীন - স্পষ্টবাদী - আপোষহীন। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তিকে সামনাসামনি খণ্ডন করতে সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু সংস্কার ও ভোটের রাজনীতি অনেক স্পষ্ট উচ্চারণকে থামিয়ে দেয়। গোঁজামিল আড়ষ্টতা তাঁর চিন্তার প্রকাশকে কখনও বাধাপ্রাপ্ত করেনি।

দ্বিতীয় বিজ্ঞান মনস্কতার দর্শন ও যুক্তিবাদী জীবন বোধে তিনি ছিলেন প্রদীপ্ত দীপশিখা। এই মুহূর্তে দেশব্যাপী হিন্দুত্বের নামে যে উগ্র ধর্মীয় উম্মাদনা হিংসার আগুন ছড়াচ্ছে, তিনি ছিলেন এসবের এক শান্ত, কিন্তু অটল দৃঢ়তায় প্রতিবাদী। বিজ্ঞান কী, কেন? — এসব নিয়ে তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ আমাদের, বিজ্ঞান কর্মীদের শিক্ষিত করে।

অধ্যাপক দাস লিখেছেন, 'মানব প্রজাতি তার অস্তিত্বকালের শতকরা ৯৯.৫ ভাগ সময়েই জীবকেন্দ্রিক (Bio-centric) দর্শনের অনুগামী ছিল। মাত্র হাজার দশেক বছর হল তার মস্তিষ্কনির্ভর সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বুক থেকে ছিটকে সরে এসে এক রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতার দুর্গ তৈরি করে প্রকৃতিকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছে, প্রকৃতির সঙ্গে এক চিরস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। প্রকৃতির সকল সম্পদ লুণ্ঠন করে, তার সকল নিয়ম, অনুশাসন ভাঙচুর করে কেবলমাত্র নিজের সুবিধা, ক্ষমতা ও অভিরুচির মাপকাঠিতে নির্ধারিত স্বতন্ত্র এক প্রকৃতির রচনায় ব্যস্ত। সৃষ্টির মধ্যেই এই দ্বিতীয় সৃষ্টি নিয়েই সে মত্ত। এটাই তার মনুষ্যত্ব, এই বলে তার পিঠ চাপড়ানো হয়েছে বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে'।

অধ্যাপক দাসের বহু মূল্যবান রচনা পশ্চিমবাংলার বহু পত্রিকায়, দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর অনেক বই এখন বাজারে অলভ্য। সব কিছু নিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করা হোক। পশ্চিমবঙ্গের জনবিজ্ঞান আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক আন্দোলন — সবখানেতেই তিনি অগ্রজ বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে সমাদৃত। তাঁর সৃষ্টিকার্য সংরক্ষণ ও ব্যবহার ও পুনর্মূল্যায়নের জন্য চাই তারকমোহন দাস — চর্চা প্রয়াস। আশা করব, পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠনগুলি একাজে তাদের আন্তরিক দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে পিছপা হবে না।

অধ্যাপক তারকমোহন দাস ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

জন্ম — ১৯২৪, ১মার্চ। কলকাতা, খিদিরপুর, (২৩ কার্লমার্কস সরণি), উদ্ভিদবিজ্ঞানী।

স্ত্রী — নমিতা দাস। এক ছেলে ও এক মেয়ে।

শিক্ষা — এম এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা) - ক.বি.। পিএইচ. ডি. (উদ্ভিদবিদ্যা) — ১৯৫৩ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। ডি.আই.সি., লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়।

— পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ ফেলো। আমেরিকার পারডু ও উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়। (১৯৬২ - ৬৩) ও (১৯৬৩ - ৬৪)।

কর্মজীবন — অধ্যাপনা, ক.বি.(কৃষি বিভাগ)। বিষয় — উদ্ভিদ, শারীরবিদ্যা।

— পরিবেশ বিজ্ঞানের কোঅর্ডিনেটর ও ডিন, ক.বি.।

— Indian Biologist (দ্বিবার্ষিক)—৪০বছর ধরে সম্পাদনা (প্রতিষ্ঠাতা)।

— প্রকাশিত গবেষণা পত্রের সংখ্যা — ১১০টি (দেশে ও বিদেশে)।

বিজ্ঞান লেখক ও সমাজমনস্ক কর্মকাণ্ড —

(১) বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক হিসাবে স্বীকৃত।

(২) বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ (Popular Science) আন্দোলন ও জনবিজ্ঞান (People Science) মূলক আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রবক্তা। অংশগ্রহণকারী।

(৩) যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে (অনীশ সংস্কৃতি) অক্লান্ত কর্মী; অকপট যোদ্ধা।

(৪) পরিবেশ আন্দোলনের বিবিধ কর্মকাণ্ডে পথপ্রদর্শক-শিক্ষক, জীবন বিজ্ঞান বিষয় প্রবর্তনে ওঁর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কোঅর্ডিনেটর (Life Science Centre)।

(৫) জনসংখ্যা(Population) বৃদ্ধি রোধে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন - সচেতনতা প্রয়াসে।

(৬) জনপ্রিয় বক্তৃতা (স্লাইড প্রদর্শন সহ), DVD ও VCD তৈরি করে আধুনিক শিক্ষা প্রয়াসে নবভাবনার প্রসারী। Indian Association for Colour Transpar ency এবং Environmental, Socio Economic & Data Manegement study centre - প্রতিষ্ঠাতা।

সম্মাননা — (i) ১৯৮০, কৃষি বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস।

(ii) ডিন, কৃষি ও পশুচিকিৎসা বিষয়ে, ক.বি.(১৯৮৭ - ৮৯)।

(iii) কোঅর্ডিনেটর, পরিবেশবিদ্যা, ক.বি. (১৯৮৬ - ৮৯)।

(iv) সমুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (কলকাতা)। কোঅর্ডিনেটর, (১৯৮৯ - ৯২)।

(v) কোঅর্ডিনেটর, গঙ্গাবেসিন প্রজেক্ট, পরিবেশ দপ্তর, কেন্দ্রীয়সরকার (১৯৮৪ - ৮৮)।

(vi) প্রধান নিরীক্ষক, প্রজেক্ট — উদ্ভিদ ও বায়ুদূষণ, কেন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তর (১৯৮৫ - ৮৮)।

(vii) নরসিংহ দাস পুরস্কার (দিল্লি, ১৯৬২), রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮২), অধ্যাপক শৌরীন্দ্রমোহন সরকার মেডাল, বোটানিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গল।

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য পুরস্কার, ড. এস সি রায় মেডাল ইত্যাদি।

(viii) Prof. T M Das Commemoration Volume, Indian Biologist. Vol. - 38, 2006, pg. - 226

অধ্যাপক তারকমোহন দাস রচিত গ্রন্থরাজি

ক) বাংলা জনপ্রিয় গ্রন্থ ঃ

১) আমার ঘরের আশেপাশে (১৯৬২)। নরসিংহ দাস পুরস্কার প্রাপ্ত (নিনি, ৫টি সংস্করণ)।

২) পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য? (১৯৭৮)। ৪র্থ মুদ্রণ (পরিমার্জিত) — ১৯৯৮। (রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত) জোনাকি প্র. লি., ১০০ টাকা, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

৩) মানুষ একটি বিপন্ন প্রজাতি (১৯৯৬) — শৈব্যা। ১৫০ টাকা, ১৯২ পৃষ্ঠা। (কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পুরস্কারপ্রাপ্ত)

৪) জীবন ও পরিবেশ (বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী পটভূমিতে) (২০১০) — দে'জ। ২৫০ টাকা, ২৩২ পৃষ্ঠা।

৫) বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত দর্শন (১৯৯৯) — জ্ঞানবিচিত্রা। ২০ টাকা, ২৬ পৃষ্ঠা।

৬) বিজ্ঞান মনস্কতা আধুনিক জীবনে অপরিহার্য (২০০০)। অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ।

৭) স্টকহোম বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন — একটি পর্যালোচনা (২০০১) — ঐ, ২০০১, ১০ টাকা, ১৬ পৃষ্ঠা।

৮) প্রবালদ্বীপ (VCD সহ) (২০০৬) — জ্ঞানবিচিত্রা। ১০০ টাকা।

৯) পিঁপড়ের জীবন দর্শন (VCD সহ) (২০০৯) জ্ঞান বিচিত্রা।

খ) ছাত্র পাঠ্যগ্রন্থ ঃ

১) জীবন বিজ্ঞান (VI, VII, VIII, IX, X) (১৯৭০ থেকে ১৯৭৭) — ম্যাকমিলান কোং। গড়ে প্রতিটি বই ২৫ টি সংস্করণ।

২) ঐ (নিউ সিলেবাস) (VII — X) — দীপ প্রকাশন।

৩) পরিবেশ প্রসঙ্গ (স্নাতক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য) (২০০০) — শৈব্যা প্রকাশন। ২০০০, ১০৫ টাকা, ৩৩৩ পৃষ্ঠা।

গ) ইংরাজি গ্রন্থ ঃ

১) Environs (Vol. I & II) – Life Sc. Centre. C.U. 1984, 1985

২) Assay and Application Methods in Plant Growth Regulations. Ed. Indian Biologist.

৩) Ganga – A Scientific Study (1991) - Ed. The Ganga Project Directorate. New Delhi.

ঘ) অন্যান্য ঃ

i) Indian Biologist (দ্বিবার্ষিক) - প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (আমৃত্যু)। Life Science Centre. C.U.Kol -19

ii) পিএইচ ডি গবেষণায় কৃতি — ৮ জন ছাত্র; এম ফিল — ২জন, এম এসসি পাঠরতা ছাত্র / ছাত্রীদের গবেষণা নিবন্ধ লেখায় সহায়তা — ৬২ জন।

iii) VCD – A modern medium of Instruction ২০ টি বিভিন্ন বিষয়ে।

লেখক বিজ্ঞানকর্মী ও পরিবেশবিদ। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ।

নিবন্ধ

কবিতায় কি বক্তব্য থাকার প্রয়োজন আছে?

সুকুমার রুদ্র

কবিতা বিষয়ক আলোচনায় অনেককে বলতে বলতে শোনা যায়- "কবিতার মধ্যে বক্তব্য থাকার কী প্রয়োজন? গল্পে বক্তব্য থাকে। কবিতা ও গল্প তো এক নয়। একটা গল্প পাঠ করে কিংবা শুনে যদি প্রশ্ন করা হয়- 'ইহা হইতে কী উৎপত্তি হইল?'- তাহলে প্রশ্নটা যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু কবিতা পাঠ করে বা শুনে কেউ যদি এ প্রশ্নটা। রে, তবে তাকে হাস্যাস্পদ হতে হয় এবং ধরে নেওয়া হয় যে সে কবিতার কিছু বোঝে না। আলোচক তাঁর এই বক্তব্যের স্বপক্ষে বহুল প্রচলিত সেই গল্পটি শোনান - মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' শুনে বিজ্ঞানী নিউটন প্রশ্ন করেছিলেন — 'আফটার অল হোয়াট ডাজ ইট প্রুভ?' নিউটনের প্রশ্নে অনেকে হেসেছিলেন।

কিন্তু এই গল্প শুনিয়ে প্রমাণ করা যায় না, কবিতাতে বক্তব্য থাকার প্রয়োজন নেই। কবিতা দিয়ে হয়তো কিছু প্রমাণ করা যায় না; কিন্তু কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি নিজের উপলব্ধিকে তো ভাষায় প্রকাশ করবেন। কবির অন্তরের উপলব্ধি যতই উন্নত ও সমৃদ্ধ হোক না কেন, তিনি যদি তা ভাষায় সঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারেন; তবে তাঁকে কবি আখ্যায় ভূষিত করা ঠিক হবে না। অনেক কবি হয়তো বলবেন- 'আমার উপলব্ধি আমার কবিতায় প্রকাশ করেছি। পাঠক বা শ্রোতা যদি তা অনুধাবন করতে না পারে; তার দায় কবির নয়। সবাই কি সব কিছু বুঝতে পারে'? এই কথার পক্ষে শ্রোতা বা পাঠককে আবার একটা বহুল প্রচলিত গল্প শোনানো হয় - পিকাসোর এক চিত্রপ্রদর্শনীতে কোন এক চিনা মহিলা পিকাসোর ত্রিমাত্রিক ছবির কিছু বুঝতে না পেরে শিল্পীকে প্রশ্ন করেছিলেন ছবি সম্পর্কে। পিকাসো তখন ওই মহিলার হাতে থাকা চিনা ভাষায় বইটা নিয়ে বলেছিলেন - 'এতে নিশ্চয় কিছু লেখা আছে। কিন্তু আমার কাছে এগুলো হিজিবিজি আঁকিবুকি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আমি চিনা ভাষা জানি না।' চিনা মহিলা এ কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে সরে পড়েছিলেন।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে চিনা ভাষা কিংবা ত্রিমাত্রিক ছবি সম্পর্কে কিছু না জানলে দু'টোর কোনটাই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন শিক্ষিত বাঙালি কবিতাপ্রেমী যদি কোন কবিতা পড়ে বা শোনে এবং সে কবিতার কিছু বোধগম্য না হয় তার কাছে; তবে এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে, সে কবিতা বোঝে না। বাংলা ভাষায় অন্য কোনও প্রাঞ্জল কবিতা যে পাঠক বুঝতে পারছে অথচ একই কবির অন্য কবিতা পাঠক যখন বুঝতে পারছে না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই কবিতায় কবি তাঁর উপলব্ধিকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর উপলব্ধি কবিতায় প্রকাশ করাতে আরও দক্ষতার প্রয়োজন — যাতে সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে তাঁর উপলব্ধি পরিব্যাপ্ত হয়। পাঠকের মগজে কবিতাটা ঢোকেনি, তার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে — এরকম মন্তব্য করে পাঠককে ছোটো না করে কবির ভাবা উচিত নিশ্চয় কোন ত্রুটি আছে তাঁর কবিতায়। তাই পাঠকের মগজে তিনি কবিতার বিষয়টাকে ঢোকাতে পারেননি।

কোন কবিতায় কিছু অপরিচিত ভারী-ভারী শব্দ ও অবাস্তব এবং আশ্চর্যজনক কিছু উপমা থাকলেই তা কবিতা হয় না। ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার, রূপক ইত্যাদি অবশ্যই থাকবে। কিন্তু

এই সবের মাংস-রক্ত-চর্মের আবরণের মধ্যে হাড়ের কাঠামোর মতো কবির উপলব্ধিটাও অবশ্যই থাকবে। সেই উপলব্ধিটাই তো কবিতার বক্তব্য। ছন্দ-অলংকারের আবরণের মধ্যে যদি উপলব্ধিটা হারিয়ে যায়; পাঠক যদি তা খুঁজে না পায়, সেখানে কবির অক্ষমতাই পরিস্ফুট হয়।

ছন্দের আবর্তে কবির অনুভূতি হারিয়ে যাওয়ার দোহাই দিয়ে কিংবা কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে চলার দোহাই দিয়ে আজকাল কবিতাতে ছন্দ লুপ্ত হতে চলেছে। ছন্দের কবিতা নাকি কবিতা মকসো করার পর্যায়ে লেখা হয়। কবিতাতে ছন্দ থাকতেই হবে ব্যাপারটা এমন নয়। ছন্দ না থাকলেও কবিতা হতে পারে। তবে পাঠকের কাছে বা শ্রোতার কাছে কবিতাকে পৌঁছে দিতে ছন্দ অনেকটা সাহায্য করে। ছন্দের তাল (রিদম) পাঠকের বিক্ষিপ্ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করাতে পারে। সমগতিতে নিয়ে আসতে পারে। যে কারণে, আমরা অন্যমনস্ক হয়েও যদি কোন ছন্দের ছড়া কিংবা গান শুনি, তখন তার তালে তালে আমাদের হাতের আঙুল বা পায়ের পাতা নড়তে থাকে অর্থাৎ কবিতাতে ছন্দ থাকলে পাঠক বা শ্রোতা ছন্দের জন্য কবিতাতে মনোযোগী হয়ে পড়ে। তখন কবির উপলব্ধি সহজেই পাঠকের মনে প্রবিষ্ট হতে পারে।

আজকাল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সৌজন্যে অজস্র কবিতা পাঠের আসর হয়। ফলে কবিতাপ্রেমীরা কবিতা পড়ার চেয়ে কবিতা শোনে বেশি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বেশির ভাগ কবিতা শ্রোতার মরমে পৌঁছাতে পারে না। শ্রোতা অমনযোগী হয়ে পড়ে। এর অবশ্য অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে একটা কারণ - কবিতাতে ছন্দ না থাকা। যদি কবির সুন্দর ছন্দময় আবৃত্তির মাধ্যমে তাঁর মনের আবেগকে শ্রোতার মধ্যে এক আবেগের সেতুবন্ধ রচিত হয়। সেই সেতুপথে কবির উপলব্ধি ও বক্তব্য শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করে। কিন্তু আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয় না। ফলে কবিতার মধ্যে বক্তব্য খুঁজে পায় না।

কবিতার মধ্যে কবি যতই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা বলতে থাকুন না; সমাজের কাছে তাঁকে ফিরতেই হয়। সমাজ বাদ দিয়ে তো কবির অনুভূতি বা উপলব্ধি জাগে না। কবিও সমাজের মধ্যেই বাস করেন। সমাজের কথা বলতে গেলেই সমাজের সমস্যার কথা, পাওয়া-না-পাওয়ার কথা এসে যায়। যেগুলো বক্তব্য ছাড়া আর কিছু নয়। সামাজিক উপলব্ধির কথা কবিতাতে থাকলেই তবে কবিতা কালজয়ী ও দীর্ঘজীবী হতে পারে। শুধুমাত্র কবির নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও ইচ্ছার কথা দিয়ে কবিতা নিশ্চয় লেখা যায়। কিন্তু সে কবিতা তেমন জনপ্রিয় হয় না। পাঠক মনের মণিকোঠায় সযত্নে রেখে দেয় না। এ কথার পক্ষে একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও স্বচ্ছ হবে। রবীন্দ্রনাথের দু'টি কবিতার কথা ধরা যাক। 'ভরা ভাদরে' ও 'সোনার তরী' - এই কবিতা দু'টি একই সময়ে রচিত। কবিতা দু'টির ছন্দ ও মাত্রা একই। একই গ্রন্থে কবিতা দু'টি গ্রথিত। 'ভরা ভাদরে' কবিতায় কবি ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও ভাবনা এবং ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন। এ কবিতাটি কিন্তু তেমন জনপ্রিয় হয়নি, যতখানি হয়েছে 'সোনার তরী' যে কয়েকটি লাইন কেউ আউড়ে দিতে পারেন। কারণ, 'সোনার তরী'তে একটা বক্তব্য আছে এবং সে বক্তব্য হল সামাজিক দায়বদ্ধতার বক্তব্য। কবি এ-কবিতায় 'আমি'র মাধ্যমে এক চাষির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমাজের একটা শ্রেণির বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। সে চাষি তার ছোটো খেতে পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলিয়েছে। তার

সেই ফসল মহাজনের নৌকাতে সব তুলে দেওয়া হয়েছে। চাষের ক্ষেত ও চাষির মন দু'টোই এখন খালি পড়ে আছে। চাষির মনে অব্যক্ত ব্যথা। তার শ্রমলব্ধ ফসল সব নৌকায় তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাজনী নৌকায় ওই চাষির অর্থাৎ শ্রমদানকারীর জায়গা নেই। তার ফসল নিয়ে নৌকা চলে যায়। শূন্য নদীর তীরে চাষি পড়ে থাকে। আকাশের ঘন মেঘ যেন চাষির মনের জমাট বাঁধা দুঃখ। এখানেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে কবিতাতে কবির বক্তব্য এবং সে বক্তব্য সমাজচেতনার ও কর্তব্যবোধের কথা। এতে কিন্তু কবিতার কোথাও শিল্পবোধের ঘাটতি হয়নি। খুব স্বাভাবিক ভাবে সামাজিক একটা বক্তব্য 'সোনার তরী' কবিতায় এসে গেছে। সেই কারণে 'সোনার তরী' ভরা ভাদরে'র চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়।

সুতরাং কবিতার বক্তব্য থাকবে না, এ-ধারণা সঠিক নয়। বরঞ্চ থাকলে এবং তা সমাজচেতনার বক্তব্য হলে সে কবিতা কালজয়ী ও জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।
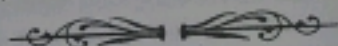
কবিতা

আয়না

অনুপ চট্টোপাধ্যায়

বুঝতে চাওনি তুমি হ্রাকী আকাশ
সময়ের নৌকো জানে সব ....
প্রথম কদম ফুল স্মৃতি কাতরতা —
নির্ভুল আবেগ নিয়ে স্বপ্নের ভেতর তুমি
তুমি আজও তেমনি স্বপ্নময়।

ছায়া ফেলেছিল যাঁরে শ্রাবণের স্রষ্ঠ
তবু নীর্থ করিনি টাইটানিক ....
অনায়াস আয়নায় রাত্রি - দুপুর চোরাটান
চোরাটান, হৃদয় গভীর অনুরাগে।

ভোরের বিছানা জুড়ে কামনাতাড়িত কিছু ভুল ....
সূর্যাস্ত নিবিড় এখন অ-প্রকাশিত চিঠি —
লজ্জিত জনপথ বড়ো বেশি কুয়াশাকাতর
ব্যর্থতা কী নিষ্ঠুর জ্বালাময় বিষ।

জ্যোৎস্না ভাঙা টুকরোগুলো ক্রমশ বিস্তার
মন কেমন করা অড়োয়া বাজনা ....
দাঁড়িয়ে মধ্যরাত তেমনি আন্তরিক
আজও ঠাঁয় ছায়া ফেলে, শুভেচ্ছা পল্লব।

আউশ ধানের ক্ষেত

দুলালচন্দ্র ঘোষ

আউশ ধানের চাষে
ভরেছে সকল ক্ষেত
চাষির মনে আনন্দের ঢেউ
ভরেছে সকল দেশ।
আউশ ধানের ক্ষেতে
ভরেছে কত ঘাসে
ঘাস নিড়াতে বসেছে চাষি
মনের সুখেতে।
সকল দেশের সেরা সে যে
আমার দেশের চাষি
মনের সুখে ধান বুনেছে
সারা দিনমান চাষি।
চাষি ভাই সব লাঙল চষে
মই দিয়েছে শেষে
মনের সুখেতে গান ধরেছে
ফিরেছে বাড়ি শেষে।
এই ভাবেতে হাসির মাঝে
পেকে গেল ধান,
চাষির মনে আনন্দের ঢেউ
দেশে এল বান।
সেই বানেতে ভেসে গেল
আউশ ধানের ক্ষেত
চাষির দুখে দুখী সবাই
কাঁদল সারা দেশ।

'বঙ্গদেশের প্রতিটি গ্রাম ঘুরিয়া, প্রত্যেকটি গ্রামের ছড়া, প্রবাদ, গান,গল্প, কিংবদন্তী, খাল-বিল, হাওড়, হাট-বাজার, মঠ, মন্দির, মসজিদ, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, অশন-বসন, ধর্ম, শিল্পকলা, আমোদ-প্রমোদ, শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভাব

তরুণকুমার চৌধুরি

দু - মুঠো অন্ন খুঁজি, এ হাতে লাঙল ধরে
বেহেস্তের ফুল বাগিচায় নিয়ে যাব সঙ্গে করে

চাঁদ ওই লাঙল প্রান্তে, আমার এই আঙুল টাকে
ঘরে ফিরি শূন্য হাতে কেটে খাই আঙুল টাকে।

এ হাতে জাগিয়ে তুলি, কেঁদে ওঠে রুগ্ন শিশু
অভাবের যন্ত্রণাটা বোঝে না আমার যিশু।

বেশ তো সুখেই আছি; অনাহারে অর্ধাহারে
ঈশ্বরকে জানিয়ে শিশু এর বেশি আর না মারে!

হাতিয়ার হাতেই আছে; ঘরে নেই রুগ্ন শিশু
সে ছিল বুকের পাঁজর ভাঙা ঘরে আলোর যিশু।
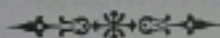
গল্প

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা

প্রবীর আচার্য

কেমন আছেন দাদু?

একটা টিউশানি সেরে অপর টিউশানি বাড়ির দিকে হনহন করে হেঁটে চলেছি। এ সময় কারও সাথে দেখা হলে সাধারণ ভদ্রতাটুকুও করার সময় থাকে না। তবুও একেবারে সামনে পড়ে যাওয়ায় কুশল প্রশ্নটা করতেই হল। সত্যদাদু ইশারায় আমাকে রাস্তার একপাশে সরে আসতে বললেন। তারপর পকেট থেকে একখানা সাতভাঁজ করা কাগজ বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন — পড়। অবাক হয়ে গেলাম — সত্যদাদু কি আজকাল কেমন আছেন সেটা কাগজে লিখে বুক পকেটে পুরে রাখেন নাকি? আত্মহত্যা করার আগে লোকে এরকম করে শুনেছি।

কাগজটা হাতে নিয়ে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে একটা দুটো করে ভাঁজগুলো সবে খুলতে শুরু করেছি, হঠাৎ অধৈর্য হয়ে খপ্ করে আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলেন। দাও দাও আমিই পড়ে শোনাচ্ছি, তিনি সুর করে পড়তে শুরু করলেন —

বসন্তের আগমনে উঠল ফুটে ফুল,
তাই না দেখে চাঁদের হাসি ঝরছে যে আকুল।

আমি আকুল হয়ে কাগজটার দিকে তাকালাম — ওরে বাব্বা! এ যে রীতিমতো কবিতা! আর ফুলস্কেপ কাগজের দুপাতা ভর্তি শুধু পিঁপড়ের সারি। এ কবিতা পুরো শুনতে হলে আমার দ্বিতীয় টিউশনিটা নির্ঘাৎ কামাই হবে। কিন্তু সত্যদাদু নির্বিকার চিত্তে পড়ে চলেছেন

তাই না দেখে ডালে ডালে কত পাখি,
কাকের পিছে ফিঙে লাগে দেখেছো কভু তা কি?

সত্যদাদু যেভাবে ফিঙের মতো আমার পিছে লেগেছেন তাতে আজ দ্বিতীয় টিউশনিটা নির্ঘাৎ ফাঁকি দিতে হবে। ফুটপাতে হেঁটে যাওয়া লোকগুলো কেমন কট্‌মট্‌ করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। হয়ত ভাবছে বুড়ো পাগলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুর ধরেছে। সত্যদাদু কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে সুর চালিয়ে যাচ্ছেন —

তাই না দেখে মৌমাছিরা তুলছে যে গুঞ্জন,
ফুলের বনে মধু খেয়ে করছে যে ভনভন্‌।

সর্বনাশ! ফুল-মৌমাছি-কবিতা — এই বয়সে সত্যদাদু কি নতুন করে কারও প্রেমে পড়ে গেল নাকি? প্রেমে পড়লে বাঙালির আবার কবিতা লেখা রোগ দেখা দেয়। এ বিষম রোগ তো সত্যদাদুর কোনও কালে ছিল না। তবে সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় পক্ষের দিদিমাটিকে অসম্ভব ভালোবাসলেও তাঁর উপর দাদুর চরম সন্দেহ বাতিক আছে। কারণ কমবয়সি দিদিমাটি অস্বাভাবিক সুন্দরী। এ-নিয়ে দাদু-দিদিমার প্রায়ই তুলকালাম হয় জানি। দাদুর আবার দিদিমার প্রতি যত প্রেম তত বিষ। যাই হোক নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টায় বললাম, আপনার তাই না দেখে কবিতা খুব সুন্দর হয়েছে দাদু। আপনি যে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তা তো জানতাম না।

আমি কেন কবিতা লিখবো? আকাশ থেকে পড়লেন দাদু।

তবে কি রবীন্দ্রনাথের কবিতা? জিজ্ঞেস করলাম। এবার চশমার কাচের উপর দিয়ে এমন অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকালেন যে আমার মনে হল রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিটি যে কবিতা লিখতে পারেন, এমন ধারণা করাটাই আমার চরম অন্যায় হয়েছে। আমাকে অকূল পাথারে পড়তে দেখে বিজ্ঞের মতো হেসে দাদু রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন আরে এ কবিতাটা লিখেছে আমার গিন্নি মানে, তোমার দিদিমা।

তা হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করলেন দিদিমা? জিজ্ঞেস করতে করতে হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কারও প্রেমে ট্রেমে পড়লেন নাকি উনি?

অ্যাঁ! সর্বনাশ!! মুখখানা কেমন তেপুঁটালের মতো হয়ে গেল দাদুর। চড়াম্‌ করে কাগজটা মুঠোর মধ্যে পিণ্ডি করে পকেটে পুরে ফেললেন। তারপর সাঁ করে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ির দিকে দৌড় দিলেন।

আমিও কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই রে! দাদু দিদিমা আজ ধুন্দুমার লেগে যাবে। একেই নাকি সংস্কৃতে বলে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।'

(লেখক আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও 'দীপ্রকলম' নামক একটি আঞ্চলিক ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক)

অনুগল্প

সিলেবাস

সুভাষ রায়

বি.এ পাঠরতা কন্যা আঁখি এই মাত্র গোবরডাঙা থেকে পড়ে এসে, আবার নাকে মুখে কটা গুঁজে, পড়িমরি করে ছুটতে চলেছে চাঁদপাড়া পড়তে।

বলা বাহুল্য প্রিয় পাঠক বন্ধু আঁখি দুজায়গাতেই প্রাইভেট পড়তে ছুটছে। বোধকরি বাহুল্য আরো হবে যে, এ তার নিত্য দিনের রুটিন প্রায়।

চাঁদপাড়া প্রাইভেট পড়তে বেরোনোর মুখেই ও ঘর থেকে বিষম কণ্ঠে ডাকলেন মা। আঁখি একটু শোন মা। একটু শুনে যা।

আঁখি তার স্বকন্যকে রেসিং সাইকেলটা একটু মেজাজের সঙ্গে থামিয়ে বলে।

— বলোকি বলছো।

আঁখির মেজাজ হওয়াটাই বোধকরি স্বাভাবিক, কারণ বড় রাস্তায় ততক্ষণে যে এসে গেছে আরো জনা পাঁচেক আঁখি।

কদিন জ্বরে শয্যাশায়ী মা একটু হাঁপ নিয়ে নিয়ে বললেন। — আমার বড্ড জ্বর মা, আজ প্রাইভেটে না গেলে হয় নারে? আমার কাছে একটু থাক। কখন কি লাগে। ঝলসে ওঠে আঁখি।

— তোমার কাছে থাকলে আমার চলবে?

এখনো কত সিলেবাস আমার বাকি তুমি জান?

বলেই আঁখি তীর বেগে বেড়িয়ে গেল ওদের সাথে চাঁদপাড়া এস.বির কাছে।

জ্বরে শয্যাশায়ী মায়ের বড্ড কষ্ট হলো মেয়ের এমনধারা ব্যবহারে। অস্ফুটে তিনি বলেন।

— সিলেবাস, সিলেবাস, আর সিলেবাস।

বড় জানতে ইচ্ছে করে কি আছে তোদের ঐ মস্ত সিলেবাসে, তবে এই কটা কথা কেন তাতে থাকে নারে, রুগ্নশয্যাশায়ী মাকেও সেবাযত্ন করতে হয়।
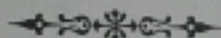
সংবাদ

ইছাপুর হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ চালু

অপ্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে ২০১২ সালে ইছাপুর হাইস্কুল উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। কলা বিভাগের বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, শিক্ষাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত, ইত্যাদি বিভাগ নিয়ে পথচলা শুরু হয়। এরপর আসে ভূগোল, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, জার্নালিজম ইত্যাদি বিষয়। এ বছর থেকে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হল। বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা পূরণ হোলো।

লোকসাহিত্য কথা

(থাপুয়া শাক। ভাল নাম কাঁকবতী। মানে কন্যাবতী। একে নিয়ে রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত লোকজ রূপকথার গল্প 'সাতভাই এর বোন কাঁকবতী'। বাংলা লোকসাহিত্যের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।)

কাঁকবতী

ড. স্বপনকুমার ঠাকুর

সাতভাই এর বোন কাঁকবতী। চাঁদপানা মুখখানা, টানটানা চোখ। কাঁচা হলুদের মতো সোনার বরণ। একঢাল কালো চুলে জলভরা শাওন মেঘের রঙ। ও যখন পদ্মদিঘিতে নাইতে যায় - পদ্ম ফুলেরা আনন্দে দোলায় মাথা। ভোমরাদল মধু খাওয়া ভুলে যায়। চারপাশে ঘুরে ঘুরে গুনগুন স্বরে গান করে। কপালে তার কুমকুমের ফোঁটা। ঝিকিমিকিয়ে ওঠে অবাক রাতের তারারা।

সাতভাই ওকে খুবই ভালোবাসে। কিনে দেয় নানা খেলনা। হাতি, ঘোড়া, বর-বউ, পুতুল, ডুরেল শাড়ি, কাচের চুড়ি আরও কত কী। বাপ-মা মরা মেয়ে তো, আদরটা তাই অল্পেশ। সাতভাই আদর করে আর বলে, 'বোনের বিয়ে দেব অচিন দেশের রাজপুত্তুরের সঙ্গে। সে আসবে তেপান্তরের মাঠ ভেঙে, টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে, কাঁকবতীকে নিয়ে উড়ে যাবে ঐ নীল আকাশের পথে। পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে।

কী মজা! কী মজা!

সাতভায়ের সাতবউ হিংসায় রাগে জ্বলে পুড়ে মরে। বলে, 'আদিখ্যেতা দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। বোন আর কারুর নেই যেন। আকাশের চাঁদ চাইলে পেড়ে দিতে হয় বুঝি!'

ঢঙ দেখে রেগে টং হয়ে ওঠে ওরা।

কিন্তু মনের কথা মনে মনে। প্রকাশ্যে বললেই বিপদ। স্বামী তো নয়; যেন মানুষ খুন করা ভয়ংকর আসামি। মনের কথা ফাঁস হলেই বনবাস নিশ্চিন্তি। অতএব চুপ করে থাকাই ভালো। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মেরে আপশোস করতে হবে নিকেশ। ঈশান কোণে টিকটিকি ডেকে ওঠে : ঠিক..... ঠিক।

দেখতে দেখতে আশ্বিন মাস এসে হাজির। নানা রঙে আকাশটা নিকানো। নদীর তীরে তীরে কাশফুলের সাদা হাসির ঢেউ। শিশির ভেজা হিমেল বাতাসে শিউলি ফুলের মন কেমন করা গন্ধ। সাতভাই এই সময় যায় দূর দেশে বাণিজ্য করতে। নদীতে ভাসলো মধুকর ডিঙা। কাঁকবতীর দু চোখের নদীও উথাল - পাথাল। 'হেই ভগবান। দাদারা যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। আর কিচ্ছুটি চাই না গো!' অনেক দিন কেটে গেল। দাদারা বাণিজ্য সেরে বাড়ি ফেরেনি। রাতে শুয়ে শুয়ে কেবলি কাঁদে। ওর কান্না দেখে গাছপালারা কাঁদে। রাতের আকাশের মুখ ভার হয়। এদিকে সকাল হতেই বউদিরা খাঁকিয়ে বলে, 'এবার থেকে তোমাকে রান্না করতে হবে বাপু। আমাদের পালা শেষ। তোমার শুরু'।

— আমি যে রান্না জানিনা।

— তাহলে ঢেঁকিশালে যাও।

— কী করবো?

— কচি খুকি নাকি? আহ্লাদ দেখো।
— আর দিলবে না, আর?
কাঁকবতী হু হু করে কাঁদে।

ছোটোবউ ঝামটা মেরে বলল, 'ন্যাকামি রাখ দাও। ঢেঁকিশালে চল। আমি পাড় দেব। গড়ে ধান নেড়ে তুমি'।

কাঁকবতী অগত্যা রাজি হলো। কিন্তু অন্যমনস্ক হতেই তার কচি হাতে পড়ল ঢেঁকির কঠিন আঘাত। হাতটা গেল থেঁতো। রক্তারক্তি কাণ্ড। ককিয়ে কেঁদে উঠলো কাঁকবতী, 'দাদাগো...'

বউরা বুঝলো সাংঘাতিক বিপদ। এই কথা যদি স্বামীদের কানে ওঠে তাহলে আর রক্ষে নেই। সবাই মিলে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করে কাঁকবতীকে ঢেঁকির ঘড়ে ভরে দিল। তারপর থেঁতলে থেঁতলে খুন করে বাড়ির বাইরে সাত হাত গর্ত করে মৃতদেহটিকে মাটি চাপা দিল। সাতবউ পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো, 'ওগো আমাদের কাঁকবতীকে বাঘে খেলো গো। আমাদের কী হবে গো!

দু-চার দিন যেতে না যেতেই বউরা দেখলো ওখানে কী সুন্দর শাক হয়েছে। কচি কচি সবুজ শাক। পাড়ার বউঝিরা শাক তুলতে এলো লুকিয়ে। হাত দিতেই শাক বলে উঠলো —

তুলো না তুলোনা পাতা
লাগবে মোর প্রাণে ব্যথা।
বউদিরা মেরে করলো ক্ষতি
সাতভাই-এর বোন কঙ্কাবতী।

সবাই চিৎকার করে বলে উঠলো, তুমি কাঁকবতী! ....?
কাঁকবতী বললো, চুপ চুপ। গোড়া উপড়ে দাও। বেরিয়ে যেতে পারি মাটি থেকে। এবার মাটি থেকে বেরিয়ে এসে সব কথা খুলে বললে ওদের। সবাই ছি ছি করলো।
বউরা মাথা হেঁট করে সব শুনলো। কিন্তু আবার তারা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। কাঁকবতীকে বললো, চল আমরা বনদেবতাকে পুজো দিয়ে আসি। তাহলে তোমার দাদারা বাণিজ্য সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে।
কাঁকবতীর আর তর সইছে না। বউরা তখন পুজোর নৈবেদ্য আর কাঁকবতীকে সঙ্গে নিয়ে বহু দূরে এক গভীর বনে গেল। তারপর সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করে কাঁকন নদীর ধারে পুঁতে দিল। কান্নাকাটি করে পাড়াপড়শিদের জানিয়ে দিল কাঁকবতীকে কুমিরে খেয়েছে।
এদিকে কাঁকবতী একটা বড়ো ঝাঁকড়া বটগাছ হয়ে উঠলো। অনেকদিন পরে সাতভাই বাণিজ্য সেরে নদীর তীরে নৌকা লাগালো। ভাইরা বললো এই বটের ছাওয়ায় বসে কিছু খাওয়া যাক। খাওয়ার জন্য বটপাতা ভাঙতেই গাছ বললো —

ভেঙো না ভেঙো না পাতা
লাগবে মোর প্রাণে ব্যথা।
বউদিরা মেরে করলো ক্ষতি
সাতভাই-এর বোন কঙ্কাবতী।

দাদারা বুঝতে পারলো বউদের অপকীর্তি। কাঁকবতীকে মুক্ত করে ভাবতে শুরু করলো বউদের কীভাবে জব্দ করা যায়।

এদিকে স্বামীরা বাড়ি ফিরতেই বউদের কী আনন্দ। আর কাঁকবতীর জন্য শুরু করে দিল মেকি কান্না। বড়ো ভাই ধমক দিল - চুলোয় যাক কাঁকবতী। এখন দু' মানুষ ভর খাল কর। সোনাদানা মোহর এসব রাখতে হবে না?
খাল কাটা শেষ। ভাইরা তাদের বউদের বললে - তোমরা সব নীচে নামো। ওপর থেকে আমরা মালপত্তর দেব আর তোমরা সাজাবে। গর্তে নামল সাতবউ। হঠাৎ করে দেখতে পেল সাতভাই এর মাঝে কঙ্কাবতী। মিটিমিটি হাসছে।
ভাইরা তখন মাটি পাথর ইঁট ঝপাঝপ করে গর্তের মুখে ফেলতে লাগলো।

(লেখক বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ও আঞ্চলিক ইতিহাসকার। 'কৌলাল' নামক একটি পুরাতত্ত্ব ও আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক)।

সংগ্রামী নারীব্যক্তিত্ব
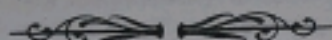
বেগম রোকেয়া - এক শিক্ষাব্রতী নারীর কথা

সঙ্গীতা ঘোষ, দ্বাদশ শ্রেণি

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষায় এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া। বর্তমানের বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলায় মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ নামক এক গ্রামে তখনকার বিখ্যাত সাবের পরিবারে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর এই মহীয়সী নারী জন্মগ্রহণ করেন। বেগম রোকেয়ার পিতার নাম জহিরুদ্দিন মহম্মদ আবু আলি সাবের এবং মাতার নাম রাহাতুন্নেসা চৌধুরানি।

বেগম রোকেয়ারা পাঁচ ভাই বোন ছিল। তাঁর বড়ো দিদি ছিলেন করিমুন্নেসা এবং ছোটো বোন হুমায়রা; দুই ভাই ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের। এই পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে রোকেয়া ছিলেন তার বাবা মা-র চতুর্থতম সন্তান। তাঁকে সবাই ভালোবেসে 'রুকু' নামে ডাকত।

বেগম রোকেয়ার পড়াশোনা শুরু হয় তাঁর দিদি করিমুন্নেসা এবং তাঁর বড়ো দাদা ইব্রাহিমের হাত ধরে। রোকেয়া তার দিদি এবং বড়দার কাছ থেকে পড়াশোনার জন্য প্রচুর উৎসাহ পেতেন। সেই উৎসাহকে কাজে লাগিয়েই সে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাবের পরিবারের ঐতিহ্য লঙ্ঘন করে বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। সাবের পরিবারের রীতি ছিল আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষা নিয়ে চর্চা করা। তাই রোকেয়া বেশ দক্ষতার সাথে উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষাগুলিকেও রপ্ত করেছিলেন।

এইভাবে পড়াশোনা নিয়ে চর্চারত রোকেয়ার বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয় ১৮ বছর বয়সে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিপত্নীক এক কন্যা সন্তানের পিতা, ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। পরবর্তীকালে রোকেয়ার দুটি কন্যা সন্তান জন্মের পর পরই কন্যা দুটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু রোকেয়া এইসব ঝড় ঝঞ্ঝার পরেও ভেঙে পড়েননি। তাঁর স্বামী তাঁকে উৎসাহ

দেওয়ায় তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর লেখা উপন্যাস "Sultana's Dream" ছাপা হয় পত্রিকায়। তারপর মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রোকেয়া তার স্বামীকে হারান।

এরই মধ্যে বেগম রোকেয়ার স্বামী মারা যাওয়ার পর প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার স্বামী মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি নিয়ে তার স্বামীর প্রথম স্ত্রী-কন্যার সাথে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বিরোধ হয়। যদিও তাঁর সতীনের কন্যা তাঁকে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি। তারপর রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে যান।

বেগম রোকেয়া এই একাকী জীবনকে সঁপে দিলেন নারীদের মঙ্গলের উদ্দেশে। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে তার স্বামীর নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়"। প্রথমে পাঁচটি ছাত্রীকে নিয়ে এই স্কুলের পড়াশোনা শুরু করলেন। মুসলিম নারীদের উন্নতিকল্পে তিনি নারীদের একত্রিত করেন এবং তাদেরকে নিয়ে "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" (নিখিলবঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন।

বেগম রোকেয়া যে শুধুমাত্র মুসলিম নারীদের জন্য একটি বিদ্যালয় ও একটি সমিতি স্থাপন করেছেন তা নয়। তিনি একজন সাহিত্যিক হিসাবেও ততটাই খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। যতটা না তিনি একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিখ্যাত। নারীশিক্ষা সম্পর্কে তার একটি বক্তব্য উল্লেখ করা হল —"অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্য-চোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বক্র তাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এম.এ; বি.এ পাশ হয় বটে, কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে। তাহাদের বিদ্যা পরীক্ষায় এ কথার সত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।

সমাজের মুসলিম নারীদের উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদা কাজ করে গেছেন। তার সাথে সাথে তাঁর সাহিত্যে অবদানও কিছু কম নয়। তাঁর গ্রন্থ 'মতিচুর' প্রথম খণ্ড (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে; প্রবন্ধ সংকলন), 'মতিচুর' দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২১ খ্রিস্টাব্দে; প্রবন্ধ সংকলন)। মতিচুর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অবশ্য লেখিকার ইংরেজি উপন্যাস 'Sultana's Dream'- এর বঙ্গানুবাদ 'সুলতানার স্বপ্ন' এবং 'ডেলিশিয়ার হত্যা' নামক এক অনুবাদ আখ্যানও প্রকাশিত হয়। নারীমুক্তি ও নারী জাগরণের সোনরহীন উপন্যাস হল 'সুলতানার স্বপ্ন'। এছাড়াও 'পদ্মরাগ' উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ 'অবরোধবাসিনী' এবং পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প লিখেছেন লেখিকা।'রোকেয়া রচনাবলি'র ভূমিকায় আব্দুল কাদির যথার্থই বলেছেন — 'মুখ্যত উদ্দেশ্যমূলক ও শিক্ষাত্মক হলেও শিল্পবিচারেও প্রায়শ রসোত্তীর্ণ'

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর মাত্র ৫৩ বছর বয়সে রোকেয়া আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও বঙ্গদেশের মুসলিম নারীজগতের শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় -এর নাম বদলে করেছেন 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়'। এছাড়া তাঁর পৈতৃক ভিটেতে তৈরি হয়েছে 'বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র'।

উখরার রথযাত্রা উৎসব

সোমনাথ রায়

উখড়া বা উখরা (গুলজারবাগ-উখড়া) পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর সাবডিভিশনের অন্তর্গত অণ্ডাল সিডি ব্লকের উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে একটি সংখ্যালঘু মহল্লা বা সংসদ।

উখরার পূর্বতন জমিদার লাল সিংহ হান্ডা পরিবারের (উখরার 'বাবু' বলে স্থানীয় মানুষের কাছে পরিচিত) প্রায় ১৭৫ বৎসরের প্রাচীন রথ এবং রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা-মহোৎসবে পশ্চিম বর্ধমানের খনি ও শিল্পাঞ্চলের আপামর মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে মেতে ওঠেন।

উল্লেখ্য যে লাল সিংহ হান্ডা পরিবার কিন্তু বাঙালি পরিবার নয় - এই পরিবারের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন লাহোরের মজিঠিয়া থেকে, ব্যবসাসূত্রে, তারপরে "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"। কিন্তু এঁরা বংশপরম্পরায় বাঙালি সংস্কৃতিকে মননের সঙ্গে মিশিয়ে দোল, দুর্গোৎসব, রাস, ঝুলন, রথোৎসব প্রভৃতি সকলের সাথে মিলেমিশে পালন করে যথার্থ বাঙালি হয়ে উঠেছেন।

উখরার জমিদার বাড়ির রথ এবং রথোৎসবের বেশ কিছু বিষয়ে অনন্যতা রয়েছে। এখানে রথ কিন্তু একটি নয় - দুটি। যদিও দেখতে প্রায় একই রকম। ছোটো রথটি জমিদার বাড়ির মহিলা সদস্যারা রশি ধরে টেনে নিয়ে যেতেন, পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে এই প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়ে এখন রথটিকে তার নির্দিষ্ট ঘরেই রাখা থাকে। তার পাশেই দোতলাসমান উচ্চতার গ্যারাজে তিনখানা তালা-লাগানো লোহার গেটের পেছনে সারা বছর সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। এই রথ জনসমক্ষে আসে শুধুমাত্র রথের দিন ও উল্টোরথের দিন।

উখরার বড়ো রথটি বাংলার ধাতুশিল্পের একটি অত্যন্ত মনোহর, অত্যুচ্চ ও অনুপম নিদর্শন। বিলুপ্তপ্রায় হস্তশিল্পের এই অমূল্য নিদর্শনটি যে কোন কালের সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পের তালিকায় অনায়াসে ঠাঁই পাবে। উখরার রথটি সামগ্রিকভাবে নয়নশোভন অলংকরণে সুসজ্জিত যা শিল্পানুরাগী দর্শককে কেবলমাত্র মুগ্ধ করে না, শিল্পীর কারিগরি নৈপুণ্য কী উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিল সেদিকেও নির্দেশ করে।

তারাপদ সাঁতরা "পশ্চিমবঙ্গের পিতলের রথের তালিকা"য় উখরার উল্লেখ করেছেন। ড. ত্রিপুরারঞ্জন বসু বলেছেন, "অণ্ডাল থানার উখড়ার জমিদার লাল সিং হান্ডে পরিবারের পিতলের রথটি নির্মাণে প্রধান শিল্পী ছিলেন বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার আমুড়িয়া-অমরপুরের রাধাবল্লভ কর্মকার। কিন্তু প্রধান সহযোগী ছিলেন টিকরবেতার শিল্পী রমানাথ কর্মকার"। রথটিতে আগে কোনো নির্মাণলিপি ছিল না। সম্প্রতি রাধাবল্লভের নাতি শ্রী আশিস মেহতরীকে দিয়ে একটি ফলক রথের সামনের দিকে সংযোজিত করা হয়েছে —

ওঁ শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউর রথ
উখড়া
ওঁ শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউর রথ যাত্রার প্রচলন
হইয়াছিল ১৭৬৩ শকাব্দে, বাংলা ১২৪৮ সালের

৯ই আষাঢ় মাসে।

মহামতি ৺রঘুনাথ সিংহ মহাশয়ের পঞ্চম

পুত্র পুণ্যাত্মা ৺শম্ভুনাথ সিংহ দ্বারা

কাষ্ঠনির্মিত রথটি নির্মাণ করাইয়া -

ছিলেন শিল্পী রামগোপাল সেন দ্বারা।

তাঁহার চতুর্থ পুরুষের বংশধরেরা সেই

কাষ্ঠ নির্মিত রথটিকে বর্তমানে মনোরম

রূপে রূপান্তরিত করাইয়াছিলেন

অমরপুর নিবাসী রাধাবল্লভ মেহতরী

(কর্মকার) দ্বারা। এই নামাঙ্কিত ফলকটি

রাধাবল্লভ মেহতরীর নাতি শ্রী

আশিস্ মেহতরী দ্বারা অঙ্কিত হইল।

বারোটি ২৩" ব্যাসের চাকার ওপর এই নবরত্ন রথটি দাঁড়িয়ে আছে। সবথেকে নিচের পাটাতন থেকে চূড়া পর্যন্ত রথটির উচ্চতা ২৫´৬"। মাটি থেকে উচ্চতা ২২ ফুট। রথটির দৈর্ঘ্য ১৫´৮" আর প্রস্থ ১৫´৬"।

তারাপদ সাঁতরার মতে রথশিল্পীরা মন্দিরের স্থাপত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন না মন্দিরের কারিগররা রথের সৌকর্য দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা আর এখন বলা মুশকিল। যাই হোক উখরার রথটি যে সনাতন বাংলা নবরত্ন মন্দিরের ধরনেই তৈরি হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পেতলের রথটির গায়ে লক্ষ করা যায় অবিশ্বাস্য সূক্ষ্মতার কাজ যা রিলিফের কাজগুলিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। রথের চারদিকের রিলিফ ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হল — জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, পূজিত হচ্ছেন; অনন্তনাগে শ্রীবিষ্ণু; গড়ুরের ওপর শ্রীবিষ্ণু; রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সামনে হনুমান গড় করছেন; ওঁ-এর ভেতর রাধাকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি হাতে; নৌকাবিলাস; কালীয়দমন; শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীদের দোল উৎসব। কৃষ্ণ ও বলরামের গোষ্ঠলীলা; মহাভারতের যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্য; সিদ্ধার্থ হাঁস ও দেবদত্ত; প্রলয়নাচনে নটরাজ; শ্রীকৃষ্ণের পাশা খেলা; ঝুলন; নৃসিংহাবতার; শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু; পরশুরাম সিংহের পিঠে বসে মাদুর্গা, কোলে ছোট্ট গণেশ। গীতগোবিন্দের পদ অনুকরণে রাধার পা ধরে কৃষ্ণের ক্ষমা চাওয়ার চিত্ররূপ ইত্যাদি।

রথের প্রতিটি দিকের নীচের দিকের থাকে রয়েছে দু'পাশে দু প্যানেলে দুটি রিলিফ। মাঝখানে কলস এবং ছ'খানি রেলিংয়ের মতো দণ্ড বা 'বর্শা'; দ্বিতীয় থাকে দু'পাশে দুটি রিলিফের কাজ এবং মাঝে ঠাকুরের সিংহাসনের মতো স্থানে একটি বড়ো কাজ। তারাপদ সাঁতরার পর্যবেক্ষণ "………. যে রথগুলির নকসা বা খোদাই করা কাজ আছে তা আবার দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্রথমটি হল স্বল্প গভীর দাগ কেটে নক্সার কাজ এবং অপরটি হল পিছন থেকে নক্সায় ছাঁচ দিয়ে পিটিয়ে উঁচু করা রিলিফের কাজ"। উখরার রথটিতে দ্বিতীয় ধরনের কাজই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। পৌরাণিক গল্প ও চরিত্র এবং ফুলকারি নক্শা করার ক্ষেত্রে আর প্রথম ধরনের কাজ শুধুমাত্র - তাও খুব অল্প পরিমাণে — ব্যবহৃত হয়েছে কলস ও নকশার ক্ষেত্রে। রথটিতে একটি প্রমাণ মাপের ঘোড়া এবং রথের চালকের

মূর্তি ছাড়া আর কোন মূর্তি ব্যবহৃত হয়নি। ন'টি রত্নের বড়ো রত্নটি ছাড়া আটটি চূড়াতেই তিনটি করে কলস, চক্র ও নিশান আছে। কেবল টিভি-র কেব্‌লের কারণে বড়ো রত্নটির কলস, চক্র ও নিশান খুলে রাখা হয়েছে।

জমিদার পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কাছে জানা গেছে প্রতিবছর প্রায় ষোল কেজি তেঁতুল লাগে রথটি পরিষ্কার করতে। রথযাত্রা শুরু হওয়ার আগে গোপীনাথ জিউ-এর মন্দির থেকে শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউ, রাধিকা এবং অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহকে চৌদোলায় বসিয়ে কীর্তন সহযোগে রথের কাছে এনে প্রদক্ষিণের পর রথের সর্বোচ্চ কক্ষে তোলা হয়। ২০০৫ সাল থেকে ট্রাক্টর দিয়ে রথ টানা হচ্ছে, তবে এখনো ভক্তরা রথের দড়ি ধরে টানতে পারেন। এখানে রথের দিন এবং উল্টোরথের দিন — এই দু'বারই রথ টানা শুরু হয় বিকেল সাড়ে চারটেয়। রথটিকে শোভাযাত্রা করে কয়েকশো মিটার গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং গ্যারেজে ঢুকিয়ে রাখা হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে উখরার রথতলা থেকে বাজপায়ী মোড় পর্যন্ত লোকশিল্পের বিভিন্ন পশরা নিয়ে মেলা বসে এবং প্রচুর দর্শনার্থীর আগমন হয়। রথের দড়ি ধরার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পূর্বতন জমিদার পরিবারের বর্তমান সদস্যরা এবং এস্টেটের কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে একসাথে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখেন। জমিদার বাড়ির মহিলারা এবং আগত ভক্তরা চাল ও বাতাসা ছুঁড়ে প্রণাম করেন। একবার রশিতে হাত ছোঁয়ান। কিন্তু আর কতদিন?

অণ্ডাল-সিউড়ি-সাঁইথিয়া ডিভিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন উখরা। জি টি রোডের অণ্ডাল বাস স্টপে নেমে মিনিবাসে অনায়াসেই আসা যায় উখরা। কলকাতা থেকে ট্রেনে (৭৮টি দূরপাল্লার ট্রেন আছে) ১৮৬ কিমি এবং গাড়িতে ১৯৩ কিমি দূরত্ব। আসানসোল থেকে দূরত্ব ৩৮.৫ কিমি। লোকশিল্পপ্রেমীদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এই অসামান্য লোকশিল্পের নিদর্শনটিকে একবার অন্তত প্রত্যক্ষ দর্শন করুন।

(লেখক তারাপদ সাঁতরা স্মারক নিধির সাধারণ সম্পাদক ও 'পুরালোকবার্তা' নামক একটি পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক)

প্রবন্ধ

গুরু মাহাত্ম্য ঃ সেকাল একাল

মৃনাল ভট্টাচার্য

পৌরাণিক লোকগাথায় আছে, দেবগুরু বৃহস্পতিতনয় কচ মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা আয়ত্তকল্পে দেবলোক ছেড়ে মর্তলোকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে এসেছিলেন শিষ্য হয়ে। বিদ্যালাভের পথে তাঁর সাহচর্য মিলেছিল শুক্রকন্যা দেবযানীর সাথে। কচ - দেবযানীর আখ্যান এখন গল্প কথা।

প্রাচীন ভারতের সমাজজীবন চতুরাশ্রমে বিভক্ত ছিল। চারটি আশ্রম ছিল — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সেই সময় ছাত্রজীবনকে বলা হত ব্রহ্মচর্যাশ্রম। শিক্ষককে বলা হত গুরু, আর ছাত্ররা সব তাঁর শিষ্য। শিষ্যরা দেবজ্ঞানে গুরুসেবা করত। গুরুকে দেবতার আসনে বসিয়ে শিষ্যরা পাঠগ্রহণ করত, যে কারণে গুরুকে তারা গুরুদেব বলে সম্বোধন করত। তাদের গুরুপ্রণাম মন্ত্র ছিল —

গুরুঃ ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বরঃ,
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

বৈদিক ভারতবর্ষে গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ছাত্ররা গুরুগৃহে এসে শিক্ষালাভ করত, গুরুরা ছিলেন গৃহী। সব গুরুর আশ্রম যে বনের মধ্যে ছিল, এমনটা কিন্তু নয়। অনেক গুরুর আশ্রম লোকালয়ে ছিল। কোনো কোনো লোকালয় অনেক গুরুর সমাগমে সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন কালেই সেই সব জায়গায় গড়ে উঠেছিল বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিষ্যদের চরিত্র গঠন এবং প্রকৃত মানুষ করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয় নিয়েই গুরুরা প্রাচীন শিক্ষার ধারা নির্ণয় ও নির্মাণ করেছিলেন — যা সে দিনের সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করত। সাধারণভাবে বানপ্রস্থীরা গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করতেন, তাঁরা তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা শিষ্যদের শিক্ষাপ্রদান করতেন। সে কালেও তাই গুরু বা শিক্ষকরা ছিলেন সমাজ গড়ার কারিগর। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মত। শিষ্যদের পক্ষে গুরু-নিন্দা করা তো দূরের কথা, গুরুনিন্দা শোনাও ছিল মহাপাপ। শিষ্যদের মধ্যে ধনী -দরিদ্রের কোনো ভেদ ছিল না, তাই সমাজের দরিদ্রতম ছাত্রটিও শিক্ষার সমান সুযোগ পেত। বৈদিকযুগে গুরুরা শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে শিষ্যদের পাঠদান করতেন। শিষ্যরা গুরুমুখনিঃসৃত কথা শুনে গভীর চিন্তা বা মননের সাহায্যে তা' মনে রাখার চেষ্টা করত। তারপর নিদিধ্যাসন বা একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে জ্ঞান আয়ত্ত করত। বেদ বহুদিন যাবৎ লিপিবদ্ধ ছিল না, শুনে শুনে শিষ্যরা চতুর্বেদ আয়ত্বে প্রয়াসী হত, তাই বেদের অপর নাম ছিল শ্রুতি।

আমার জীবনে শিক্ষকতা ছিল প্যাশন, একটা ভাবাবেগ, আমার ভালবাসা। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এ দেশে ছিন্নমূল হয়ে আসা একটা উদ্বাস্তু পরিবারের যেমনটা হয়, আমাদের পারিবারিক অবচ্ছলতা, আমার কৈশোরের ওই প্যাশনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েই আমি হয়ে গিয়েছিলাম অনেক বাড়ির গৃহশিক্ষক। সেকালের গৃহী শিক্ষকের ঠিক

উল্টো। ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমায় পড়াতে হত। আমার কর্মজীবনও শুরু হয়েছিল শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হয়ে, ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে। ইছাপুর জুনিয়ার হাই স্কুলের (আজ তা' উচ্চ মাধ্যমিক) প্রথম দিন থেকেই আমি রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর অনুমোদিত একজন সহঃ শিক্ষক। ওই স্কুলের সাথেই দীর্ঘদিন জড়িয়ে থাকার সুবাদে একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক শিক্ষাব্রতীর কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁর কাছেই বর্তমান কালের শিক্ষক মাহাত্ম্যের আখ্যান হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যা' আমার মনের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে আছে।

গুরুপ্রণাম মন্ত্রে গুরু ব্রহ্মাঃ, গুরু বিষ্ণুঃ থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসাই যায় যে গুরু বা শিক্ষকরা হলেন ভগবানের অংশ — যা' স্বর্গ থেকে ছিটকে মর্তে এসে পড়েছে। আজ কর্মজীবনের প্রফেশন বা পেশা বোঝাতে শিক্ষকরা লেখেন শিক্ষকতা, চাকুরি কেউ লেখেন না, কারণ চাকুরি কথাটির মধ্যে চাকর শব্দটি লুকিয়ে আছে। শিক্ষকরা হলেন মাস্টারমশাই, মাস্টারের মানে হল প্রভু। শিক্ষকতা এমন একটা পেশা, যেখানে চাকুরি করা মানুষটাই হলেন প্রভু। অন্য কোনো পেশায় এটা নেই। শিক্ষকদের কাজের মালিক হল শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা টিউশন ফি দিত; তা' থেকে বেতন হত শিক্ষকদের। আমি যখন শিক্ষক ছিলাম, সে সময় এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। আজ মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক। শিক্ষার্থীর টিউশন ফি সরকার দিয়ে দেয়, অর্থাৎ শিক্ষকদের বেতন আসে সরকারি কোষাগার থেকে। শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজের মালিক মহল ছাত্রছাত্রী সমাজ — যাদের বকাবকি করা যায়, প্রয়োজনে শাস্তিও প্রদান করা যায়। মালিককে শাস্তি দেওয়ার সুযোগ অন্য কোনো পেশায় নেই। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি — ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে, সমাজের কাছে। যা' অন্য কোনো পেশার সাথে তুলনা করা যায় না।

বর্তমানে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক — সব বিদ্যালয়েই সরকার থেকে শিক্ষার্থীদের একই রকমের পোষাক পরিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, ভিন্ন সম্প্রদায় সকলেরই এক পোষাক — যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে সমান অধিকারবোধ গড়ে ওঠে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের পোষাক সম্পর্কে বিশেষ কোনো নির্দেশিকা নেই, কোনো কিছুতেই বাধা নেই — তবে এই বিষয়ে সংস্কার হল প্রধান বাধা। এই সংস্কারের অর্থ হল ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন বিশ্বাস, যা' মানুষের মনে গ্রথিত হয়ে থাকে, কোনোভাবেই তা' দূর করা যায় না। তাই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীরা প্রতিনিয়ত আন্দোলন করে থাকেন। বেশ কিছুদিন আগে শিক্ষিকাদের সালোয়ার কামিজ পরিধানের বিরুদ্ধে কিছু সংস্কারপন্থী মানুষ সরব হয়েছিলেন। কিন্তু অনেকের মতেই শিক্ষিকাদের সালোয়ার কামিজ ব্যবহার — অশালীন তো নয়ই, বরং অনেক বেশি মাত্রায় শালীন। মানুষের মনে দীর্ঘদিনের সংস্কার বা দেখার অভ্যাসের বশে শিক্ষিকা মানেই শাড়ি-ব্লাউজ পরিহিতা আদর্শ রমণী — সেই খানে সালোয়ার কামিজ পরিহিতা শিক্ষিকাদের বেশ কিছুটা সময় লেগে যাবে, অন্যের মনের সাথে, চোখের সাথে নিজেদের পরিচ্ছদকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টাতে। যদি কেউ দেখেন যে, তাঁর বাড়ির পুরোহিত স্যুট, প্যান্ট, টাই, বুট পরে পুজো করতে এসেছেন — তিনি মহাপণ্ডিত হলেও বা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হলেও — তাঁকে পুরোহিত হিসাবে গ্রহণ করতে ওই ব্যক্তি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়বেনই।

সম্মানের প্রশ্নে শিক্ষকের আসন শ্রেষ্ঠতম। সমাজে তাঁর স্থান সবার আগে। তাঁর সম্মান সর্বত্র। এঁরা মানবকল্যাণে কাজ করতেন, মানুষ গড়ার কারিগর এঁরা। রামপ্রসাদী গানে আছে — "এমন মানবজমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।" এই মানবজমিনে আবাদের কাজ করেন শিক্ষকরা। বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় চলছে, তাতে শিক্ষকদের কাজ ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। একারণ বর্তমানে এই পেশায় যুক্ত যাঁরা, তাঁদের আরও পরিশিলিত হয়ে, নিজেদের জ্ঞানে আরও শান দিয়ে, শিক্ষকতার কক্ষে আসতে হবে। শিক্ষকদের কাজ আক্ষরিক অর্থে শিক্ষাদান করা, কিন্তু শিক্ষকের বড় কাজ হল শিক্ষার্থীর প্রতিভাকে বিকশিত করা, জাগরুক করা। শিক্ষার্থী হল জ্ঞান বিকশিত হওয়ার প্রদীপ, প্রদীপে তেল, সলতে, সব আছে। সলতেতে জ্ঞানের আগুন প্রজ্বলনের পরে শিক্ষকের কাজ হবে ওই প্রদীপে সলতে ঠেলার কাঠি হওয়া। তিনি শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিকাশে, প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করবেন। শিক্ষকেরও শেখার আছে, তিনি প্রতিনিয়ত পরিবেশ থেকে, পরিস্থিতি থেকে, শ্রেণি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবেন। শিক্ষকের দ্বৈত কাজ — শিক্ষাদান ও গ্রহণ, এই ভাবেই হবে তাঁর পথপরিক্রমা। একজন মেধাযুক্ত, উচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত, উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মন বুঝে তার শিক্ষাগ্রহণের কাজেই না লাগাতে পারলেন — তা হ'লে তাঁর উচ্চ ডিগ্রি এবং বেশি নম্বর পাওয়ার সার্থকতা কোথায়?
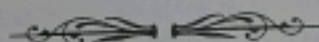
প্রবন্ধ

গ্রাম সাংবাদিকতার বিস্মৃত অগ্রদূত কাঙাল হরিনাথ

সত্যব্রত দাস

উনিশ শতকের বাঙালি মননে চিন্তায় যে নবজাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তা মূলত ছিল নগরকেন্দ্রিক। ব্যাপক পরিবর্তনের উত্তাল তরঙ্গ শহরে শিক্ষিত মানুষের বৌদ্ধিক সত্তাকে আন্দোলিত করলেও গ্রামবাংলার তথাকথিত অশিক্ষিত দরিদ্র সাধারণ মানুষের কাছে তার সুফল ছিল অধরা। কারণটা সহজবোধ্য। গ্রামে তখনও শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। সেখানকার মানুষরা খেতে-খামারে কাজ করা গরীব প্রজামাত্র। পশ্চিমি জানালা দিয়ে আসা শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো গায়ে মাখার চেয়েও দুবেলা উদরান্নের সংস্থানের তাগিদটা তাদের কাছে জরুরি ছিল। তার উপর ছিল দেশির জমিদার আর বিদেশির নীলকর সাহেবদের শোষণ-পীড়ন-দমনের আতঙ্ক। শহর থেকে বহু দূরের পাড়াগাঁয়ের এই দরিদ্র নিপীড়িত অসহায় মানুষগুলোর মুখে সেদিন প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছিলেন যে যুগন্ধর মানুষটি তাঁর নাম হরিনাথ মজুমদার — কাঙাল হরিনাথ নামে যিনি সমধিক পরিচিত। শহরে চাকচিক্য বর্জিত দূর গ্রামের কৌলিন্যহীন এক সাধারণ মানুষ। সাধারণ, কিন্তু যেন এক জ্ঞানশুদ্ধ তেজোদীপ্ত ঋষি। গরীবের বন্ধু, জমিদারের দমন-পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন যোদ্ধা। যাঁর অস্ত্র হাতে ছিল শুধু একটি কলম মাত্র। সেই সময়ের আলোহীন, কণ্ঠহীন গ্রামসমাজে শাসকের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিবাদি ছবি এঁকে গিয়েছেন তাঁরই সম্পাদনায় সুদূর গ্রাম

থেকে প্রকাশিত গ্রামীণ সংবাদপত্র — গ্রামবার্তা প্রকাশিকার ক্যানভাসে।

ভাবতে অবাক লাগে, রাজানুগ্রহ লাভের আশায় এখন সংবাদমাধ্যমগুলি যেখানে রাজতোষণে ব্যস্ত, সেখানে আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগের এক প্রায়ান্ধকার গ্রাম্য পরিবেশে এক কৌলিন্যহীন অর্থহীন আটপৌরে মানুষ কেমন করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে শাসকের অন্যায়-অবিচার আর গরীব প্রজার দুঃখকষ্টের কাহিনির বিবরণ অকপট সততার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। শাসকের প্রলোভন বা রক্তচক্ষুও থামাতে পারেনি তাঁর নির্ভীক কলমকে। ইতিহাস তাঁর অসম লড়াইকে ভোলেনি। ভুলে গেছি আমরা। আজ কজন আমরা কাঙাল হরিনাথের নাম জানি? কজন মনে রেখেছেন গ্রাম-সাংবাদিকতার অগ্রপথিক এই ক্ষুদ্র মানুষটার সংগ্রামের ইতিহাস?

হরিনাথের জীবন একদিক যেমন ছিল কর্মময়, তেমনই ছিল ধর্মময়। জীবনের নানা উত্থান-পতন, ঘাত, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, সত্যাদর্শের টানা-পোড়েন, শেষ জীবনের মরমী বাউল সাধনা — সব মিলিয়ে তাঁকে করে তুলেছিল এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। হরিনাথের জন্ম অবিভক্ত বাংলার (অধুনা বাংলাদেশের) কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে — ১৮৩৩ সালে। জন্মের এক বছর পরেই শিশু হরিনাথ মাতৃহারা। তাঁর মাত্র সাত বছর বয়সে বাবা হলধর মজুমদারেরও মৃত্যু হয়। কাকার সাহায্যে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলেও আর্থিক অসঙ্গতির কারণে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। মাত্র বারো বছর বয়সে কুমারখালি বাজারে দৈনিক দু'পয়সা বেতনে কাপড়ের দোকানে চাকরিও করতে হয়েছিল কিছুদিন। কিন্তু আদর্শগত বিরোধে সে চাকরি ছাড়তে হয়। এর কয়েক বছর পর লেখাপড়ার জন্য কলকাতায় আসেন হরিনাথ। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আবার গ্রামে ফিরে যান। জীবিকা নির্বাহের জন্য কুমারখালির এক নীলকুঠিতে শিক্ষানবিশি শুরু করেন। কিন্তু আদর্শগত কারণে সে চাকরিও ছাড়তে হয় সত্যনিষ্ঠ হরিনাথকে। এরপর গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ না করলেও প্রতিষ্ঠানবহির্ভূত শিক্ষার্জনে হরিনাথের ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। বাংলা বই পড়তেন গোগ্রাসে। নিজ প্রচেষ্টা আর অধ্যবসায়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর-এ কাজ নেন ও লেখালেখি শুরু করেন। গ্রামের সংবাদ লেখার হাতেখড়িও তাঁর সংবাদ প্রভাকরে। এর পরে গ্রামে ফিরে এসে ১৮৬৩ সালের পয়লা বৈশাখ মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ করেন 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'। কর্মক্ষেত্র কুমারখালি গ্রাম। ১৮৬৫ তে গ্রামবার্তা পাক্ষিক পত্রিকা হয়। ১৮৭০ থেকে গ্রামবার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর শিক্ষকতা এবং গল্প, কবিতা, উপন্যাস রচনা এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে হরিনাথের হাতেখড়ি — সাহিত্য রচনা এবং সাংবাদিকতায়। সংবাদ প্রভাকর প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে। প্রভাকরে সেকালের সমাজজীবনের অভাব-অভিযোগের কথা কিছু কিছু প্রকাশিত হলেও, মূলত সেটা ছিল সাহিত্য পত্রিকা। পরবর্তীকালে নানা বিষয়ে হরিনাথের সঙ্গে তাঁর গুরু ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শগত বিরোধও হয়। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন কিছুটা রক্ষণশীল। ঠিক সে সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, সংবাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ ইত্যাদি সাময়িকপত্রে এবং মফস্বল থেকে

প্রকাশিত কিছু পত্রিকায় সেকালের সমাজজীবনের দুরবস্থা এবং অভাব-অভিযোগের কথা কিছু কিছু প্রকাশিত হলেও প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার গরীবগুর্বো সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা বিশেষ স্থান পেত না। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের জোয়ার গ্রামাঞ্চলে সামান্যই পৌঁছতে পেরেছিল। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে তেমন কোনও সাময়িক পত্রও প্রকাশিত হত না। ঠিক এরকম একটা আবহে হরিনাথ প্রকাশ করলেন তাঁর গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ১৮৬৩ সালে এ পত্রিকা প্রকাশনার উদ্দেশ্য তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক। প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রিকা যতই প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সম্বাদাদিতেই পরিপূর্ণ। গ্রামীয় অর্থাৎ মফস্বলের অবস্থাদি কিছুই প্রকাশিত হয় না। তজ্জন্য গ্রামবাসীদিগের কোনও প্রকার উপকার দর্শিতেছে না। যেমন, চিকিৎসক রোগীর অবস্থা সুবিদিত না হইলে তাহার প্রতিকারে সমর্থ হন না, তদ্রূপ দেশহিতৈষী মহোদয়গণ গ্রামের অবস্থা অবিদিত থাকিলে কিরূপে তাহার প্রতীকার করিতে যত্নবান্ হইবেন?' তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি শুনিলাম বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহার মর্ম অবগত হইতে সংকল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্যালয়ও স্থাপিত হইবে। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে তাহা গবর্ণমেন্টের কর্ণগত করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।'

পরবর্তীকালে প্রকৃত অর্থেই হরিনাথের গ্রামবার্তা হয়ে উঠেছিল গ্রামাঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষের মুখপত্র। গরীব, খেটে খাওয়া অসহায় বাংলার মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা দেন কাঙাল হরিনাথ। নিজের গ্রাম কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হলেও তাঁর পত্রিকার ফলশ্রুতি গ্রামের ছোট্ট পরিসরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। বৃহত্তর বাংলার চারিদিকের অত্যাচার পীড়নের সংবাদ সে সময়কার শাসক জমিদারদেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। সৎ, নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক সাংবাদিকতার অঙ্গীকার তিনি প্রথম সংখ্যার সূচনাতেই করেছিলেন — 'যাহাতে গ্রামবাসীদের অবস্থা, ব্যবসায়, রীতি, নীতি, সভ্যতা, গ্রামীয় ইতিহাস, মফস্বল রাজকর্ম্মচারীগণের বিচার এবং আশ্চর্য ঘটনাদি প্রকাশিত হয়, তাহাই পত্রিকার প্রধানোদ্দেশ্য এবং লোকরঞ্জনার্থ, ভিন্ন দেশীয় সংবাদ ও গল্পাদি, নানারূপ চিত্তরঞ্জন বিষয়ও লিখিত হইবেক।' তাঁর এই অঙ্গীকার তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য বা অর্থাভাব তাঁকে দমাতে পারেনি। সাংবাদিক হিসাবে যে দায়বদ্ধতা আজকের দিনে দুর্লভ।

সব আরম্ভেরই একটা আরম্ভ থাকে। গরীবদরদি, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীকচিত্ত হরিনাথ শৈশব থেকে যে কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন তার মধ্যেই ভবিষ্যতের হরিনাথের সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে ছিল। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন অসহায় হরিনাথকে জীবিকার্জনের জন্য নীলকুঠিতে শিক্ষানবীশের কাজে জুড়ে দেন তাঁর আত্মীয়রা। কুঠির কাজে সে সময় যথেষ্ট মান-মর্যাদা এবং অর্থও ছিল। কিন্তু সাহেবদের গোলামি করার জন্য জন্মাননি হরিনাথ। কুঠিতে কাজ করার সময় নীলকর সাহেব ও কর্মচারিদের গরীব চাষি-প্রজাদের উপর অন্যায় উৎপীড়ন অত্যাচার দেখে তখন থেকেই তাঁর মন অসহায় প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তারই প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর গ্রামবার্তা প্রকাশিকার ছত্রে ছত্রে।

সংবাদ প্রভাকরে গ্রামের সংবাদ করতে গিয়ে এসব কাহিনি কিছু কিছু লিখেছেন। প্রায় আজীবন গ্রামে বাস করার সুবাদে জমিদার, মহাজন, পুলিশ, রাজকর্মচারি ও কুঠিয়ালদের অত্যাচার-নীপিড়ন সম্বন্ধে ধারণা ছিল তাঁর। গ্রামবার্তায় (১৮৭২ সালের জুন) তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'এখনও সর্দার দিয়া প্রজা ধরিয়া আনা হয়, জুতা লাঠি প্রহার করা হয়। জরিমানা করা হয়, পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দেওয়া কখনও২ প্রজা, প্রজার মা, বোন, স্ত্রী প্রভৃতিকে কাছারিতে ধরিয়া আনিতে আদেশ করা হয়, এদিকে চাঁদা মথিত প্রভৃতি আবওয়াব আদায় করিতেও ত্রুটি নাই।' জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনি লিখতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেছিলেন, ছোট জমিদারদের অত্যাচার যেন তুলনায় অনেক বেশি। তিনি লিখেছিলেন, 'কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত প্রদেশে কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদার আছেন তাঁহারা নানা প্রকারে উপকর আদায় করিয়া প্রজাদিগকে সর্বদা জর্জরীভূত করেন।' (ডিসেম্বর, ১৮৬৬)। রেয়াত করেননি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারদেরও। 'বিরাহিমপুর পরগণা'র জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে প্রজাদের দুরবস্থার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলতে ছাড়েননি হরিনাথ।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক লেখক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সন্তানদের জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে সবচেয়ে সমালোচনাপ্রবণ ছিলেন কাঙাল। তাঁদের শোষণ পীড়ন অত্যাচারের খবর গ্রামবার্তায় প্রকাশ পেতে থাকলে প্রথমে ঠাকুরপক্ষ নাকি কাঙালকে অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করতে চেষ্টা করেন। তাতে সফল না হতে পেরে লেঠেল পাঠানো হয়। কিন্তু 'লাঠিয়ালরা তেজস্বী হরিনাথের দেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না।' তার একটা কারণ দরিদ্র চাষা ও সাধারণ মানুষ তাঁকে সমর্থন করতেন এবং প্রসিদ্ধ বাউল লালন ফকিরের অগণিত শিষ্যসামন্ত কাঙালের অমূল্য জীবন রক্ষার অন্যতম প্রহরী ছিলেন।' তবে একথা সত্য যে, হয়তো সেইজন্য ও ভদ্রতাবশে হরিনাথ ঠাকুর-পরিবার সম্পর্কে প্রকাশ্যে ততটা কঠোর হতে পারেননি। কিন্তু তাঁর অন্তর্বেদনা ও ক্ষোভ ধরা পড়েছে কাঙালের অপ্রকাশিত দিনপঞ্জিতে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে সেই দিনপঞ্জি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। আট খণ্ডে লেখা প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠার সেই দিনপঞ্জি সম্পর্কে জানা গেছে :

> রবীন্দ্রনাথ নিজে দিনলিপিটি পড়েছিলেন। তিনি হরিনাথের একটি কথাও অসত্য বলে ঘোষণা করেননি, শুধু অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যেন তাঁর জীবিতকালে তাঁর পিতাঠাকুরের এই কাহিনিগুলি প্রকাশিত না হয়।

হরিনাথের অপ্রকাশিত সেই ডায়েরির আজ আর কোনও হদিশ নেই। তবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'চতুষ্কোণ' পত্রিকা আজ থেকে অর্ধশতাব্দীর ও বেশি আগে বাংলা ১৩৭০ - ৭১ সালে সেই ডায়েরির কিছু অংশ প্রকাশ করে। ডায়েরির সেই অংশ পড়লে ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে হরিনাথের মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে :

'দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারীতে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ইংরাজী কৌশল (পোলিশ) জমিদারদিগের অস্থি মজ্জিতে যতই প্রবেশ করিতে লাগিল নায়েবগণের স্বাধীনতা ক্রমেই নষ্ট হইল। তাঁহারা ছায়াবাজীর পুতুল হইয়া থাকিলেন। সূত্র কূটকৌশল পরায়ণ কলিকাতার বাবুদের হস্তে থাকিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পর্যন্ত মহর্ষি নাম গ্রহণ করেন নাই, সে পর্যন্ত প্রজাগণ তাঁহাকে দুঃখ নিবেদন করিয়া কিছু ফল

পাইয়াছে, কিন্তু তিনি মহর্ষি নাম পরিগ্রহ করিলে, তাহার পর প্রজার হাহাকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে অবসর পায় নাই। দুরবস্থা দেখিয়া নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। .... মহর্ষি অবসর গ্রহণ করিলে, যাঁহারা জমিদারী শাসনের ভার পাইলেন, তাহারা যতোধিক ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, ততোধিক কূট কৌশল বুদ্ধির অর্থাৎ ইংরাজ পেলিশির কৃতদাস। সুতরাং ব্রহ্মপরায়ণতা, ধার্মিকতা ও দেশহিতৈষতার চিহ্নস্বরূপ নীতিকবিতা রচনা করিয়া বাহিরে যতই কেন সাধুতা প্রদর্শন না করুন, অন্যায় শোষণ ও তজ্জন্য অত্যাচারে প্রজার শরীরে আর রক্ত থাকিল না ....। একদিকে জমিদারের অট্টালিকা কোথায় বিলাসসুখের হাস্যধ্বনিতে কোথায় ব্রাহ্মধর্মের স্তুতি স্তোত্রপাঠে ধ্বনিত হইল।'

এ হেন গ্রামবাংলার দরিদ্র অসহায় মানুষের মুখপত্র এক নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ পত্রিকাও একদিন বন্ধ করে দিতে হয় হরিনাথকে। মূলত নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, শাসক জমিদারদের বিরোধিতা, এবং ঋণভার কাঙালকে বাধ্য করেছিল পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে। ১৮৬৩ অর্থাৎ ১২৭০ বঙ্গাব্দ থেকে ১৮৮৫ (১২৯২ বঙ্গাব্দ) মোট ২২ বছর চলেছিল গ্রামবার্তা প্রকাশিকা। মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ পেলেও শেষ পর্যন্ত গ্রামবার্তাকে সাপ্তাহিকে রূপ দিয়েছিলেন তিনি। তবে এই বাইশ বছরও একটানা চলেনি গ্রামবার্তা। মাঝে কয়েকবার প্রকাশনা বন্ধ থাকে। পত্রিকার প্রথম প্রকাশের দশ বছর পর ১৮৭৩ সালে হরিনাথ নিজের গ্রাম কুমারখালিতে 'মথুরানাথ যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর এখান থেকেই গ্রামবার্তা ছাপা হত। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পরে হরিনাথের কাঁধে বিপুল ঋণের বোঝা চেপে যায়। আনুষঙ্গিক নানা কারণে তাঁর মনও ভেঙে যায়।

এর পরই হরিনাথ আধ্যাত্মজীবনে প্রবেশ করেন। শুরু করেন পাঁচালি, বাউল, আধ্যাত্মভাবনার গান লেখা। তৈরি করেন কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল গানের দল। তাঁর লেখা সেসব গান সেকালে আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাঙালের সমকালীন লালন ফকিরের সঙ্গেও সখ্যতা ছিল তাঁর। সেই সময় লালনের পাশাপাশি ফিকিরচাঁদের গানও ফিরত মানুষের মুখে মুখে। তাঁরই লেখা একটি বিখ্যাত গান 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে' সত্যজিৎ রায় তাঁর পথের পাঁচালি ছবিতে ব্যবহার করেছেন।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা বন্ধ হবার পর কেটে গেছে ১৩২ টি বছর। পৃথিবী বদলে গেছে। সংবাদপত্র প্রকাশনা এবং মুদ্রণ ব্যবস্থায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অথচ সেদিন হরিনাথ যে সততা, নিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে গ্রামের সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তা আজও কত প্রাসঙ্গিক। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা এবং কাঙাল হরিনাথকে ঘিরে সেদিন গড়ে উঠেছিল এক সাহিত্যিক পরিমণ্ডল। যে পরিমণ্ডলকে আলোকিত করেছেন হরিনাথেরই ভাবশিষ্য জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীর মোশারফ হোসেনের মত মানুষেরা। গ্রামবার্তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে আজও মফস্বল বাংলা থেকে অজস্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। অথচ এই গ্রাম সাংবাদিকতার অগ্রদূত কাঙাল হরিনাথ আজ বিস্মৃতির গর্ভে।

তথ্যঋণ ঃ ধনঞ্জয় ঘোষাল সম্পাদিত 'হরিনাথ মজুমদার ও বাঙালিসমাজ'
প্রকাশক — সহযাত্রী, ৮ পটুয়াটোলা লেন, কল — ৯
প্রথম প্রকাশ — জানুয়ারি, ২০০৭, দাম - ১৫০ টাকা

ইছাপুরের জমিদারদের কথা -

বিপিনবেহারী চক্রবর্তী ও দুর্গাচরণ রক্ষিত

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বংশাবলীর সহিত খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস সমসূত্রে গ্রথিত এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র সার্বভৌম মহাশয়ের পুত্র রঘুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সময়েই তাম্বুলিগণ সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া বড়া, কাজলা, বনগ্রাম, শিমুলপুর,মধুসূদনকাটি, বিষ্ণুপুর, মল্লিকপুর ও লক্ষীপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতেই কুশদ্বীপ শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিনদিন উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল।এই মহাপুরুষই ইছাপুরের সৌধাবলী, নবরত্ন, যোড়শবাঙ্গালা, নাটমন্দির, দোলমঞ্চ ও মঠমন্দির প্রভৃতি অপূর্ব কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া ইছাপুরকে অমরাবতীর ন্যায় সুসমৃদ্ধ নগরে পরিণত করিয়া যান। বস্তুত উক্ত অট্টালিকা সমূহে এরূপ শিল্পচাতুর্য দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা দেবনির্মিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সেইজন্য আজিও এতদঞ্চলের লোকগণের বিশ্বাস যে, রঘুনাথ চৌধুরী মহাশয় ও প্রপিতামহ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় সিদ্ধ হইয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দ্বারা ঐ সকল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই রঘুনাথ চক্রবর্তী চৌধুরী মহাশয়ের জমিদারির বহুল উন্নতি সাধন করেন এবং নবাব সরকার হইতে চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশীয় ভূস্বামীগণের শ্রেণীভুক্ত হন।

রঘুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র রামেশ্বর চৌধুরী ও মধুসূদন চৌধুরী মহাশয়ও পূর্বোক্ত অট্টালিকা সমূহের সংস্কার ও পিতৃনির্মিত সৌধাবলী বর্দ্ধিত করিয়া ইছাপুরের বহুল উন্নতি সাধন করেন।

ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের বংশাবলী নিম্নরূপ তালিকা

দ্যুতি (কান্যকুব্জবাসী) ⟶ দক্ষ (আদি শূর রাজার যজ্ঞে আনীত) ⟶ কাকুৎস্থ (হড়ো গ্রামবাসী) ⟶ সুবুদ্ধিদাস ⟶ শ্রীমান্ ⟶ পশুপতি ⟶ শ্রীকর রাঘব ⟶ কমল ⟶ নীলকণ্ঠ ঠাকুর ⟶ প্রজাপতি ⟶ জগদীশ তর্কাচার্য ⟶ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ

লক্ষ্মণের কন্যা কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শিবচন্দ্রের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিবাহ করেন এবং রামচন্দ্রের কন্যাকে বেচারাম মুখোপাধ্যায়ের পিতা সায়রা নিবাসী শ্যামরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিবাহ করেন।

অধিকন্তু, মধুসূদন চৌধুরী মহাশয়ই পিতৃ প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তিগুলির যথারীতি সেবা করাইবার জন্য ইছাপুর নিবাসী সরখেল ব্রাহ্মণগণকে প্রাগুক্ত দেবালয় সকলের পরিচারক রূপে নিয়োজিত করেন। পরে, তাম্বুলীগণ খাঁটুরায় বাসভবন প্রস্তুত করিলে পুরোহিতের জন্য উঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ একপ্রকার বন্ধ ছিল।কিন্তু মধুসূদন চৌধুরী মহাশয় সরখেল মহাশয়দিগকে ইঁহাদিগের পৌরহিত্যে নিয়োজিত করিয়া দেন। তৎপরে বেড়েলা বৈচি হইতে তাম্বুলীগণ কর্তৃক আনীত শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণগণ লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

মধুসূদনের পরলোকান্তে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীশ্বর চৌধুরী মহাশয় বিষয়াধিকারী

হন। ইঁহার সময়েও ইছাপুরের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কাশীশ্বর স্বকীয় তৃতীয়পুত্র রামচরণের হস্তে জমিদারির ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

রামচরণ চৌধুরী মহাশয়ের বংশগণ নবঠাকুরের বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার সময় হইতেই খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার ইতিহাস এক নতুন জগতে পদার্পণ করেন। এই রামচরণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট সারসা নিবাসী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি খাঁটুরার পাটোয়ারি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। খাঁটুরার ঘটক মহাশয়দিগের বাটির পূর্বধারে এবং সদর রাস্তার পশ্চিমভাগে চৌধুরী মহাশয়গণের কাছারি ছিল। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই কাছারির নায়েব বা পাটোয়ার ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কুলমর্যাদা ও অসাধারণ গুণরাশি দেখিয়া রামচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত মোহিত হন এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার পরিণয়কার্য সমাপন করেন এবং খাঁটুরার আয়ের অষ্টমাংশ সেই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ স্বকীয় কন্যাজামাতাকে প্রদান করেন। এই বিবাহে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ ও কনিষ্ঠ খেলারাম।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় স্বর্গান্তে খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই মাতামহ প্রদত্ত জমিদারির অধিকারী হন। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জমিদারি অংশে পাইয়া গোবরডাঙ্গায় এক প্রকাণ্ড বাটি নির্মাণ করেন। কিন্তু খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় পিতার পরলোকান্তে সেই বাটী ত্যাগ করিয়া বর্তমান বাটী নির্মাণ করাইলেন এবং আপনার প্রভূত ক্ষমতাবলে জমিদারিও ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন। এদিকে এই সময় হইতেই চৌধুরী মহাশয়গণের প্রভুত্ব ও সম্পত্তি হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল এবং তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। এক্ষণে এই খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধরগণই খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার সর্বেসর্বা, সমাজপতি ও একমাত্র ভূস্বামী।

(খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী- বিপিন বেহারী চক্রবর্তী ও দুর্গাচরণ রক্ষিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা -দ্বিতীয় মুদ্রণ ও প্রথম জি.আর. অই প্রকাশনা, ২০১০ বইটি থেকে পুর্নমুদ্রিত পৃষ্ঠা নং - ১০৭ - ১০৯ সম্পাদক)
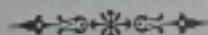
সংবাদ

গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল - পুনরায় চালুর দাবি

গোবরডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালটি পুনরায় চালু করার দাবিতে এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা আন্দোলন করছেন। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশাসনিক সভায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা এই হাসপাতালটি চালু করা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন। অথচ গোবরডাঙ্গা এবং আশেপাশের প্রায় ৪ থেকে ৫ লাখ মানুষ এই হাসপাতালটির উপর নির্ভরশীল। ইতিমধ্যে হাসপাতাল চালুর দাবিতে বনধ্ ও পালিত হয়। গোবরডাঙ্গা পৌর উন্নয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাসপাতাল পুনরায় চালুর দাবিতে স্মারকপত্রও দেওয়া হয়েছে।

ইছাপুরের গোবিন্দদেব

অনিমেষ চৌধুরী

নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।।

ইছাপুরের চৌধুরী পরিবারের লোকেরা এবং অধুনা ইছাপুরের জনসাধারণও গোবিন্দদেবের যে বিগ্রহটি পূজা করিয়া থাকেন তাহা একক। মূর্তিটি কষ্টিপাথরের তৈয়ারি প্রায় দু'ফুট উঁচু। পদযুগলে নৃত্যের মুদ্রা। দুইহাত বংশীবাদনে রত। মুখটি ডানদিকে সামান্য কৌণিক। সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন রূপ। চোখ দুটি শঙ্খের মতো শুভ্র। এই বিগ্রহের সুন্দর একটি পুরুষাঙ্গ আছে যাহা সচরাচর দেব মূর্তিতে দেখা যায় না। ইহার কারণ এই মূর্তি বাৎসল্যরসে পূজিত হইয়া থাকেন।

শ্রী শ্রী গোবিন্দদেবের চরণপদ্মে আজও দেখা যায়, লেখা রহিয়াছে —

"রামজীবন পৌত্রানি মুলুকানি চন্দ্র শর্মনাম"

রামজীবন - যিনি চরণপদ্মে এই লিপি লিখিয়াছেন তাঁহার নিজের নাম। আগে এই রকম প্রথা ছিল, যদি কাহারও একের বেশি পুত্র সন্তান থাকে তাহা হইলে নামের প্রথম পদগুলি পরপর লিখিয়া দ্বিতীয় পদগুলি পৃথক পৃথক না লিখিয়া মাত্র একবার লিখিলে চলিবে, যদি দ্বিতীয় পদগুলি একই রকম হয়। যেমন কোনো ব্যক্তির যদি তিনপুত্র থাকে - মনোরঞ্জন, সুখরঞ্জন ও দুঃখরঞ্জন তাহা হইলে তিনজনের নাম বলা হইত —

"মনোসুখদুঃখরঞ্জন দেব শর্মা"।

এইখানে মুলুক ও গোরা এই শব্দ দুইটির পরিবর্তে মুলুকানি (মুলুক + আনি) একটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। মুলুক ও গোরা এই উভয় শব্দের পরে চন্দ্র (চাঁদ) থাকাতে একবার মাত্র 'চন্দ্র' ব্যবহার করা হইয়াছে। রামজীবনের পৌত্র তিনজন মুলুকচাঁদ, গোরাচাঁদ ও দুর্গাচরণ। কিন্তু লিপিতে চন্দ্রের (চাঁদ) উল্লেখ আছে চরণ - এর কোনো উল্লেখ নাই। ইহার কারণ হিসাবে অনুমান করা যায় যে লিপি লিখিবার সময় দুর্গাচরণের জন্ম হয় নাই। আরেকটি বিষয়ে লক্ষ করা যায় বংশতালিকা-তে মুকুলচাঁদ আছে এবং পাদপদ্মের লিপিতে 'মলুক' চন্দ্র আছে। ইহার কারণ হিসাবে বলা যায়, দীর্ঘদিনের পূজা ও সেবার ফলে এই রূপান্তর স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়াছে। 'ম' এর 'উ' কারের বিলোপসাধন এবং 'ল' রূপান্তরিত হইয়াছে 'ন'তে। আরেকটি বিষয় শর্মনাম পদটিকে ষষ্ঠীর বহুবচনে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা গৌরবে বহুবচন হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যয় হয় যে, গোবিন্দের পাদপদ্মের লিপিটি রামজীবন চৌধুরী দ্বারা লিখিত হইয়াছিল এবং বিগ্রহটি রামজীবনের কালে নির্মিত হইয়াছিল।

রামজীবন হইতে অমূল্যচরণ পর্যন্ত সাত পুরুষ এবং অনিমেষ চৌধুরীর বর্তমান বয়স ৭১ হইলে ৩০ x ৭ + ৭১ = ২৮১ বৎসর পূর্বে গোবিন্দ বিগ্রহ নির্মিত হইয়াছিল। ২০০৩ —

২৮৯ = ১৭১৪ (এখন ২০০৩) সুতরাং গোবিন্দ ১৭১৪ খৃঃ অঃ নাগাদ নির্মিত হইয়াছিল।
এখনও প্রচলিত যে পৌষ মাসের সংক্রান্তিকে গোবিন্দদেবের জন্মতারিখ বলিয়া ধরা হয়।
সুতরাং ইংরাজি ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ বা ১৫ জানুয়ারি অথবা বাংলার ১১২০ সনের ২৯
শে বা ৩০ শে পৌষ গোবিন্দদেবের জন্ম তারিখ। সেইজন্য ঐ সংক্রান্তি হইতে জন্মোৎসব
চলিতে থাকে। ঠাকুরকে পায়েস, মিষ্টান্ন ও খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়।

১৯৪৮ - ৪৯ এর মধ্যে কোনো সময় ঠাকুরের অঙ্গহানি হয়। তাঁর ডানহাতের কব্জি ও মাথার চূড়ার উপরের অংশ ভাঙিয়া যায়। বিগ্রহ মেরামত করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয় মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে এবং বর্তমানে এই পঞ্চমীকে ঠাকুরের জন্মদিন বলিয়া নববস্ত্র পরিধান ইত্যাদি আচার পালন করা হয়। কিন্তু পূর্বেকার জন্মতিথির রীতি অনুযায়ী পৌষমাসের সংক্রান্তি হইতে পুরা মাঘমাস ঠাকুরকে এখনও খিচুড়ি ও পায়েস ভোগ দেওয়া হয়।

পূর্বে ইছাপুরের গোবিন্দদেবের মন্দিরটি নবরত্ন মন্দির ছিল। প্রথম অবস্থায় পোড়ামাটির অলংকরণে সুসজ্জিত ছিল। অলংকৃত ইটের সৌন্দর্য রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রথম তলের দুইটি দেওয়ালে পোড়ামাটির বিচিত্র কারুকার্য। ঘনীভূত কল্পলতা, বৃহৎ পদ্ম ইত্যাদি বিষয়বস্তু যে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পোড়ামাটিতে রূপায়িত হইয়াছে তাহা সত্যই অপূর্ব। বিবিধ পৌরাণিক বিষয় বস্তুও অলংকরণে ছিল। একটি প্রবেশ পথের উপরে সিংহ ও হস্তীর সুদৃশ্য ফলক ছিল। অসংখ্য ইঁট খসে যাবার ফলে কয়েকটি দেওয়াল ভাঙিয়া পড়িয়াছে। উপরে উঠিবার সিঁড়িপথও নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আমার মাতা ঠাকুরাণির বিবাহ হয়। তিনি আসিয়া দেখেন বর্তমান গোবিন্দমন্দিরের ভিত্তি খোঁড়া হইতেছিল। বর্তমানে গোবিন্দকোঠাটি ইংরাজি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়। ইহার সম্মুখের ভগ্ন মন্দিরকে গোবিন্দমন্দির বলা হয়।

ইছাপুর গ্রামকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অতীতে গ্রামের চারিদিকে পরিখা খনন করা হইয়াছিল। বর্তমানে এই পরিখা লুপ্ত হইয়াছে। ইছাপুরের গোবিন্দকোঠার নিকটে কিছু অংশ এখনও দেখা যায়। এই পরিখা খননকালে 'একচালের' (এক আসনের) একটি বাসুদেব মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি অষ্টধাতুর নির্মিত। দুই পার্শ্বে দুই সখী। ইনিও গোবিন্দদেবের সঙ্গে একই ঘরে থাকিতেন ও তাঁহার সহিত পূজিত হইতেন। দোলযাত্রার উৎসবের পূর্বে একাদশীর দিন হইতে চতুর্দশীর দিন পর্যন্ত বাসুদেব বিভিন্ন স্থানে যাইতেন। প্রথম দিন বাসুদেব রাজুর জঙ্গলে যাইতেন পা ধুইতে, দ্বিতীয় দিন মল্লিকপুর ঘাটে মধু খাইতে, তৃতীয় দিন হাটখোলায় দোলমঞ্চের সম্মুখে কাছারি করিতে এবং শেষদিন শ্রীপুরের মোড়ে পান খাইতে যাইতেন।

১৯৬৪ সালে বাসুদেবকে কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহার পর আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বাসুদেবের স্থানে নারায়ণ শিলা (লক্ষ্মী জনার্দন) ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে তারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী আশালতা দেবীর পূজিত 'গোপাল' এবং চৌধুরী বংশের "লক্ষ্মী জনার্দন" নারায়ণ শিলা ছোটো দোলায় করিয়া যাইয়া থাকেন।

ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পূজার প্রচলন চৈতন্যদেবের সময় হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মধুর ভাবের প্রতিমা স্বরূপা শ্রীরাধারাণির ভাবে থাকিয়া অহরহ শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিতেন। যদিও তাঁহার মধ্যে অন্যান্য

ভাবের প্রকাশও দেখা যাইত। বাংলার বৈষ্ণবগণ পাত্রাপাত্র নির্বিচারে শ্রীবৃন্দাবনলীলার মধুর ভাবে সাধন উপদেশ করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে শুধুই যুগলমূর্তির উপাসনা প্রচলিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণবগণও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে। গোবিন্দদেবের মূর্তি একক। গোবিন্দদেবের পূজা পদ্ধতির সঙ্গে চৈতন্যদেবের পূজা পদ্ধতির আরেকটি পার্থক্য লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেবের পূজা পদ্ধতিতে তারকব্রহ্ম নাম গীত হয়। কিন্তু গোবিন্দদেবের পূজাতে গোবিন্দ বা রাধাগোবিন্দ নাম গীত হয় এবং তারকব্রহ্ম নাম বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। এই দুইটি মূল বিষয়ে পার্থক্য আজও দেখা যায়।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, শক্তি ক্রিয়াশীল। গোবিন্দদেবের নৃত্যশীল পদযুগল আদ্যাশক্তির দ্যোতক। বংশীবাদন অনুরূপ প্রকাশ। শুভচক্ষু দৃষ্টিতে স্থিরদৃষ্টি-ব্রহ্মের রূপ। গোবিন্দের একদেহে শক্তি ও ব্রহ্ম একসঙ্গে প্রকাশিত। এখানে অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত। সেইজন্য পৃথক করিয়া "রাধা" গোবিন্দের সঙ্গে দেবার প্রয়োজন হয় নাই। এখানে গোবিন্দ একক, তিনি লীলা করছেন নানাভাবে।

"গোবিন্দ - মহাবিষ্ণু, পরমব্রহ্ম —

(লেখাটি অনিমেষ চৌধুরী কর্তৃক রচিত "গোবরডাঙা - ইছাপুরের চৌধুরী বংশ ও গোবিন্দদেব" থেকে পুনর্মুদ্রিত। বইটির প্রকাশকাল - ২রা নভেম্বর ২০০৩ ও শুভেন্দুসুন্দর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ঘটকপাড়া, গোবরডাঙা থেকে প্রকাশিত — সম্পাদক)
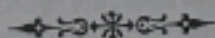
পড়শির কথা

গোবরডাঙার উৎস কথা

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

বর্তমানে বৃহত্তর গোবরডাঙাকে যে ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব প্রাচীন কালে বা মধ্যকালের গোবরডাঙাকে সেইভাবে চিহ্নিতকরণ সম্ভব ছিল না। তার অস্তিত্ব ছড়িয়ে ছিল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ও তার অন্তর্গত কুশদ্বীপের ভৌগোলিক অস্তিত্বের মধ্যে। প্রাচীনকালে নাম গোত্রহীন গোবরডাঙা ছিল গোবরডাঙাতেই। আধুনিক গোবরডাঙার নগরায়নের ও রাজনৈতিক গুরুত্বের সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে গোবরডাঙা জমিদারী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। অবশ্য মধ্যযুগের শেষ ভাগে নগর ইছাপুরের জমিদারী প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গোবরডাঙা। বিশেষ করে খাঁটুরার গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

সেই সময় (১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে) গোবরডাঙা খাঁটুরার আদি অধিবাসীগণের সঙ্গে বহিরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বিদ্বজনের সমাগমে জনজীবনে নব চেতনার সূত্রপাত হয়। সমাজ জীবনে ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। মানুষ জীবনকে প্রাচীন কাব্যগাথার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে স্বপ্নের ভেলায় ভাসতে আরম্ভ করে এবং স্থান নামের উৎপত্তির পিছনে নানা কল্প কাহিনী যুক্ত হয়। যমুনা নদীর দু'পাশের গ্রামগুলির নাম গোবরডাঙা, গোপিনীপোতা, গৈপুর, ঘোষপুর, গনেশপুর প্রভৃতি হওয়ার জন্য অধিবাসীগণ এই অঞ্চলকে

শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন এই সমস্ত গ্রামের নামের উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী ও সহচর গোপ বালক। গোপী বালিকা বা গাভীর থেকে হয়েছে।

গোবরডাঙা নাম সম্পর্কে কেউ যদি রসিকতা করে বলেন 'গোবরডাঙা' তখনই আমরা গোবরডাঙা নামের একটা কাব্যিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করি। বলি, গো শব্দের অর্থ পৃথিবী, বর অর্থে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট এবং ডাঙা অর্থে স্থল। অর্থাৎ গোবরডাঙা নামের অর্থ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান। তবে এতে আমরা যতই আত্মতৃপ্তি পাই না কেন, কোন স্থানের নাম এত বিচার বিবেচনা করে রাখা হয় না, কোন জায়গার নাম যেভাবে তালতলা, বেলতলা, ফুলতলা বা বটতলা ইত্যাদি হয়েছে গোবরডাঙা নামও ঠিক সেইভাবেই হয়েছে। 'গরু চরাণের ডাঙা' বা গোচারণ ডাঙা এমনই কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে 'গোবরডাঙা' নামের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা গোবরডাঙা শব্দের ব্যাখ্যা দিতে যাই তাহলে ' গো' অর্থে গাভী, বর অর্থে উত্তম এবং ডাঙা অর্থে উচ্চভূমি বা নদীতীর। অর্থাৎ বলা যেতে পারে গো চারণের উচ্চ স্থান বা উত্তম স্থান। কারণ, বর্তমানে যে স্থানে জমিদার বাড়ি বলে চিহ্নিত সে স্থান এক সময় বিস্তীর্ণ গোচারণ ক্ষেত্র। ঐ স্থান যমুনা এবং চালুন্দিয়া নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। আবার গৈপুরে যদি গোপদের নিবাস হয় তাহলে তাদের বহু গো সম্পদ থাকা অসম্ভব ছিল না। এক সময় চালুন্দিয়া নদী গৈপুরকে গোবরডাঙা থেকে পৃথক করে রেখেছিল। অধুনা লুপ্ত চালুন্দিয়া নদী যখন মজে এসেছিল সেই সময় নদী পেরিয়ে রাখালদের ঐ মাঠে গরু চরাতে আসাটা অসম্ভব ছিল না। তাছাড়া মাঠে প্রচুর পরিমাণে 'গোবর' পড়ে থাকাও অসম্ভব ছিল না। সুতরাং 'গোবরডাঙা' নাম গোচারণ ক্ষেত্র বা গরুর পরিত্যক্ত গোবরের স্থান বা ডাঙা থেকে গোবরডাঙা হওয়া অস্বাভাবিক নয় বরং স্বাভাবিক।

এখানকার প্রাচীন গোবরডাঙা পৌরসভার জন্ম ১৮৭০ সালে। এই পৌর এলাকাধীন গোবরডাঙা, গৈপুর, গন্ধর্বপুর, সাহাপুর, খাঁটুরা, বাগে খাঁটুরা, হায়দাদপুর, কুঠিপাড়া, রঘুনাথপুর — এই আটটি মৌজা নিয়ে গঠিত অঞ্চল 'বৃহত্তর গোবরডাঙা' নামে পরিচিত। উত্তরে ইছাপুর খাল, জামদানি, মধুসূদনকাটি ও বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে যমুনা নদী এবং পূর্বে ভেপুল, কঙ্কণা বাঁওড় ও বড়াখাল। খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কোন এক সময়ে এখানে মানুষের পদার্পন বলে ধারনা। এখনকার ভৌগলিক অবস্থান ২২° - ৫২′ - ৪০″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° - ৪৭′ - ৫৫″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পৌর গোবরডাঙার আয়তন ৩.৪৬৮ বর্গ মাইল বা ৮.৮৮০৫২ বর্গকিলোমিটার। ১৯০১ এবং ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুসারে এখনকার জনসংখ্যা যথাক্রমে ৫,৮৩১ ও ৪১, ৬১৮ জন। বর্তমানে (২০১৭) জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। ১৮৮৩ -র ডিসেম্বর ৭ তারিখে দত্তপুকুর থেকে গোবরডাঙা পর্যন্ত রেলপথ চালু হয় এবং শেষ পর্যায়ে ১৮৮৪ এপ্রিলে তা খুলনা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইংরেজ আমলে যখন এই অঞ্চলে রেল ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে তখন গোবরডাঙার কৃতি সন্তান শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গোবরডাঙার জমিদার গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজনদের চেষ্টায় বর্তমান স্থানটিতে 'গোবরডাঙা' স্টেশন স্থাপিত হয়। ২২/৪/৮৪ তে বনগাঁ পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়। এই গোবরডাঙা পৌরসভার প্রথম পৌরপিতা হয় ১৮৭০ সালে যিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইন চালু হলে ভারতবর্ষে প্রথম বিবাহ করেন — গোবরডাঙা স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এছাড়া গোবরডাঙার

বহু ভূমিপুত্র ও সন্তান ছিলেন যাঁরা গোবরডাঙা-র মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন, তাঁরা হলেন — প্রমথনাথ বসু (ভূ-তত্ত্ববিদ), অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, হাসিরাশি দেবী, জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটক প্রমুখ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বিভিন্ন নাট্যদলগুলি এই সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার নিরিখে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ, সমাজ মনস্কতা ইত্যাদি হারিয়ে যেতে দেখে আগামী প্রজন্মের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু)
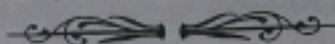
স্মৃতিকথা

আমার শৈশব

অধীরকুমার ঘোষ

আমি পরাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু অতি আনন্দের বিষয় এই যে বিশেষ করে আমাকে বেশিদিন পরাধীনতা ভোগ করতে হয়নি। আমার যখন সাড়ে ছয় বৎসর বয়স তখন ভারত স্বাধীন হয়। ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। কিন্তু আমাদের গ্রাম ইছাপুর, থানা গাইঘাটা, মহকুমা বনগাঁ ও জেলা যশোহরে থাকায় আমাদের স্বাধীনতা একদিন পরে অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে পারি। যশোহর জেলা পাকিস্তানের মধ্যে চলে যায়। কেবলমাত্র বনগাঁ মহকুমার তিনটি থানা — গাইঘাটা, বনগাঁ এবং বাগদা বাদ নিয়ে যায়। অর্থাৎ এই তিনটি থানা হিন্দুস্তানে পড়ে। সে সময় আমার মধ্যে কোনো চিন্তাশক্তি হয়নি। বুঝতে পারলাম না হিন্দুস্তান পাকিস্তান কি? কিন্তু বাবা ও কাকার মুখে শুনতাম পাকিস্তান হলে আমরা আমাদের খালের ওপারে গৈপুরে চলে যাব। ১৬ই আগস্ট সকালে আমি খেলা করছি, এমন সময় আমাদের বাড়ির সামনের রোড থেকে বিষ্টুকাকা অর্থাৎ বাবার কম্পাউন্ডার বিষ্ণুপদ দত্ত মহাশয় বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলেন। আমরা খেলা ছেড়ে ছুটে এসে দেখতে পাই বাবার ডিস্পেনসারিতে অনেক লোক ও বহু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাঁদের নিয়ে বন্দেমাতরম্ ও জয়হিন্দ ধ্বনি দিতে থাকেন। আমরা ছোটরাও তাদের সঙ্গে গলা মেলাই। তা শুনে বহু লোক জড় হয়ে যায়।

আমাদের বাড়িতে তখন ছিলেন মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। সেই সময়কার তিনি বি. এ. পাশ এবং বাবার থেকে সামান্য বড় ছিলেন। বাবা ওই দিনই জাতীয় পতাকা আনার ব্যবস্থা করেন এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দিয়ে আমাদের বাড়িতে বাঁশ পুতে পতাকা তোলার ব্যবস্থা করেন। দেখতে পাই পরস্পর পরস্পরের সাথে কোলাকুলি করতে লাগলো। আমরা অবাক নজরে দেখতে থাকি।

সে সময়ের এই স্বাধীনতা বেশ কয়েকদিন ধরে পালন করা হয়। আমি তখন গৈপুর পাঠশালাতে পড়ি। আমাদের এখানে তখন কোনো স্কুল ছিল না। ইছাপুরে গোলখোলাতে স্কুল ছিল। কিন্তু রাস্তার দুই ধারে বিরাট জঙ্গল থাকায় আমাদের ওই স্কুলে পাঠানো যেতো না। গোলখোলার প্রাথমিক স্কুল বহু পুরোনো। বহু কৃতি মানুষ ওখানে পড়েছেন।

যাই হোক, শৈপুর স্কুলে আমাদের পাড়ার আমার দিদি ও চণ্ডীপাড়ার বাসুদরি, সত্যেন, লক্ষ্মীরি, মুরারি - রা পড়ত। আমরা একসঙ্গে যেতাম ও আসতাম। আমার বাবা তখন শৈপুর গ্রামের একমাত্র চিকিৎসক। তিনি প্রায় অধিকাংশ বাড়ির হাউস ফিজিসিয়ান ছিলেন। তা ছাড়া তিনি শৈপুর পাঠশালা কমিটির সভাপতিও ছিলেন। ওই পাঠশালাতে মাস্টারমশাই ছিলেন আমাদের পাড়ার রমানাথ চক্রবর্তী মহাশয়। তিনিই প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। এ ছাড়া শৈপুরের নব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইছাপুরের গণেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহ-শিক্ষক ছিলেন। আমার বাবা সি. এন বোস মেমোরিয়াল চারিটেবল্ ডিস্পেনসারিতে ডাক্তারি করতেন। তখন প্রতিদিন বিকেলে ডাক্তারখানা খোলা থাকত। ওই সময় বাবার কম্পাউন্ডার ছিলেন রমানাথ চক্রবর্তী মহাশয়।

সত্যিকথা বলতে কি, আমাদের শৈশবে শৈপুর ছিল আমাদের ভাতবাড়ি। যেমন খেলাধুলা, স্কুল, ঠাকুর দেখা সবই শৈপুরে। সেই সময় আমাদের ইছাপুর গ্রামে চৌধুরিদের নবাড়ি ছাড়া আর কোথাও দুর্গা পূজা হতো না। সেই জন্য দুর্গা পূজার কয়েকদিন শৈপুর উত্তর পাড়ায় এবং মিত্র পাড়ায় ঠাকুর দেখতাম। সকালে স্নান করে বেরোতাম এবং দুপুরে বাড়ি ফিরতাম। সন্ধ্যায় আমাদের গরুরগাড়ি করে মায়ের সঙ্গে শৈপুর উত্তরে আরতি দেখে মিত্র পাড়ার ঠাকুর দেখে, গোবরডাঙা জমিদারবাড়ির বড়তরফের ঠাকুর দেখে সবশেষে সেজতরফের ডাকের সাজের ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরতাম। আমাদের সমবয়সিদের মধ্যে কে কতগুলি ঠাকুর দেখেছে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। যে বেশি দেখেছে তাকে যেন মনে হতো রাজ্যজয় করে ফেলেছে।

আমাদের সময়ে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খেলা খেলেছি। যেমন ফুটবল, লাট্টু, মার্বেল, চুকিলকি, গুলতি নিয়ে পাখি মারা, ঘুড়ি উড়ানো প্রভৃতি। খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজকাল মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাচ্চাদের খেলা প্রায় উঠে গেছে। বর্তমানে শিক্ষিত পরিবারে ১টি বা ২টি বাচ্চা। তাদের নিয়ে মা বাবারা সব সময় পড়ে থাকেন। সকলে চায় আমার বাচ্চা দশজনের একজন হবে। তাই শৈশবে তারা খেলাধুলা করার সময় পায় না। দুপুরে একগাদা বই পিঠে নিয়ে বিদ্যালয়। আবার কিছু খেয়ে দেয়ে বিকালে ও সকালে প্রাইভেট টিউশন। তাহলে তারা খেলার সময় পাবে কখন? শৈশবে বাচ্চারা যদি খেলাধুলা না করে তবে তাদের শরীর গঠন হবে কি ভাবে? শুধু ফুড খাওয়ালেই শরীর গঠন হয় না। তাই আমার একান্ত অনুরোধ অভিভাবকদের কাছে, আগামী প্রজন্মের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে একটু ভাবুন।

আমার ঠাকুরদা ডাঃ বেণীমাধব ১৮৭৮ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। আমার ঠাকুরমা ছিলেন দেবী অন্নপূর্ণা। সত্যি কথা বলতে কি, বেণীমাধব ঘোষের বিবাহের পরেই তার সংসার ফুলেফেঁপে ওঠে। তিনি একজন জমিদার হয়ে ওঠেন। আমাদের ইছাপুর মৌজার বেশিরভাগ অংশ, বনগাঁ মৌজার ও আমদানী মৌজার বেশ কিছু অংশ গোবরডাঙা জমিদারদের সঙ্গে বিনিময় করে নেন। সেই জমি নিজের করে নেন। প্রজারা খাজনা দিতে আসত। আমাদের সামনের ঘরে টিনের বাক্স নিয়ে দুইজন খাজনা আদায়কারি বসে থাকতেন। একজন শৈপুরের নরেন্দ্রনাথ বসু ও ইছাপুরের কেদার মিত্র মহাশয়। এটা আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার ঠাকুরদা ও ঠাকুমার মৃত্যুর পর আমরা জন্মগ্রহণ

করি। অর্থাৎ ঠাকুরদা ও ঠাকুমাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বাবার মুখে শোনা আমার ঠাকুরমা ছিলেন রত্নগর্ভা। কারণ তাঁর তিন ছেলে ডাক্তার। মন্মথনাথ ঘোষ, প্রমথ নাথ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রথম জন ছিলেন ডাক্তার, দ্বিতীয় জন ছিলেন ম্যাকডালেস কোম্পানির সুপারিনটেনডেন্ট, এবং ছোটো ছিলেন সুদর্শন, সুপুরুষ। তিনি বেণীমাধব ঘোষের সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। ইছাপুরের লোকেরা তাকে ঘোষবাবু বলে চিনতেন। শুনেছি তখন আমাদের অনেক ঘোড়া ছিল। আমার বাবা ঘোড়ায় চড়ে রুগি দেখতে যেতেন। আমার ছোটো কাকা তীব্র জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারতেন। শুনেছি, তিনি যখন গোবরডাঙা বাজারে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন গোবরডাঙার জমিদার বলতেন, ওই বেণীডাক্তারের ছোটো ছেলে যাচ্ছে। তাঁরা জানতেন বেণীডাক্তারের ছোটো ছেলে ছাড়া এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আর কেউ যেতে পারবে না। আমি তখন গাঁটুরা স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। তখন আমি খেলাধুলায় খুবই পারদর্শি ছিলাম। বিশেষ করে ফুটবল। সেই সময় ইছাপুরে একটিমাত্র ক্লাব ছিল। ইছাপুর মিলন ভারতী সংঘ। এই ক্লাবে ইছাপুর, শ্রীপুর এবং সৈপুর থেকেও কিছু লোক খেলতে আসত। আমাদের ফুটবল মাঠে দুপুর থেকে তিনবার খেলা হত। প্রথমবার বাচ্চারা, দ্বিতীয়বার মাঝারিরা, তৃতীয়বার বড়রা। আজ কিন্তু ওই মাঠে মোটেই খেলা হয় না। ওই সময় আমাদের সম্পাদক ছিলেন চণ্ডীপদ মিত্র মহাশয়। আমরা যারা খুব ভাল খেলতাম চণ্ডীপদ মিত্র তাদের খুব ভালবাসতেন। তিনি তখন গাইঘাটা হাইস্কুলের শিক্ষক মহাশয়। আমরা স্কুল থেকে বাড়ি এসে দেখি একটি রিক্সা আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রিক্সাওয়ালার হাতে একটি চিরকুট, তাতে লেখা — 'অধীর, তুমি অবশ্যই চলে এসো, গাইঘাটার হয়ে সেকেন্ড খেলাতে খেলতে হবে।' এইভাবে চণ্ডীদা আমাদের অন্য ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য নিয়ে যেতেন।

এই সময় এই অঞ্চলে তিনটি নক আউট শিল্ডের খেলা হত। ১নং শৈববালা শীল্ড — গোবরডাঙা জমিদার বাড়ির মাঠে; ২নং কল্পনা শীল্ড — গাঁটুরা আনন্দ সম্মিলনীর মাঠে; ৩নং বেণীমাধব স্মৃতি শীল্ড ও যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতি ক্লাবের খেলা হত আমাদের ইছাপুরের মাঠে। এখানে খেলতে আসত বহু ক্লাব, যেমন ইন্টালি, মানিকতলা, নিমতা, বারাসাত, দত্তপুকুর, হাবড়া, চাঁদপাড়া, ঠাকুরনগর, গাইঘাটা, গোবরডাঙা কলেজ, গাঁটুরা স্কুল ইত্যাদি। সরস্বতী-তে আমাদের মিলন ভারতী সংঘ এত ভাল খেলতো যে এতদঞ্চলের কোন ক্লাব আমাদের সাথে পেরে উঠত না।

১৯৬৭ সালে আমি বি. এ. পাশ করি। ১৯৬৭ সালেই আমাদের গাইঘাটায় নতুন বিধানসভা ক্ষেত্র তৈরি হয়। চণ্ডীপদ মিত্র মহাশয় নতুন দল অজয় মুখার্জীর বাংলা কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ান এবং জয়লাভ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী ও জ্যোতি বসু উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন। এই সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বেশ কিছু দিন এম. এল. এ. ও হন। এরপর যুক্ত ফ্রন্ট ত্যাগ করে কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে পি. ডি. এফ. সরকার গঠিত হয়। সেই সরকারে চণ্ডীদা মন্ত্রী ছিলেন।
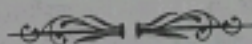
তথ্যের আলোকে ইছাপুর (প্রথম পর্ব)

বিপ্লব ঘোষ

☐ **ভৌগোলিক অবস্থান :**

অক্ষাংশ — ২২° ২১' উত্তর দ্রাঘিমাংশ — ৮৮° ১৫' পূর্ব

সাগরপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা — ১৭.৫ ফুট

☐ **উষ্ণতা :**

সর্বোচ্চ — ৪১° - ৪৪° ডিগ্রি সেলসিয়াস (মে মাস)

সর্বনিম্ন — ৯° - ১১° ডিগ্রি সেলসিয়াস (জানুয়ারি মাস)

☐ **বৃষ্টিপাত :**

বৃষ্টির সময়কাল — জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর।

বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৪০ - ১৮০ সেমি।

☐ **মাটি :**

এখানকার মাটি চাষবাসের পক্ষে সহায়ক। দোয়াঁশ ও বেলে-দোয়াঁশ এবং এঁটেল মাটির দেখা মেলে।

☐ **ফসল :**

এখানে প্রধানত ধান, সর্ষে, পাট ও মরশুমি ফসলই বেশিরভাগ চাষ হয়।

☐ **বাড়ির সংখ্যা (পরিবার) :**

১৪৮১ টি

☐ **জনসংখ্যা সংক্রান্ত :**

জনসংখ্যা ৫৯৯৯ জন (পুরুষ - ৩০৯০, মহিলা - ২৯০৯), শিশু(০-৬) - ৪৭৫ (পুরুষ - ২৪৩, মহিলা - ২৩৩), তপশিলী জাতি - ১২৩৪ (পুরুষ - ৬২৯ মহিলা - ৬০৫) তপশিলী উপজাতি- ৫৪ (পুরুষ - ২৬ মহিলা - ২৮) । সাক্ষরতা - ৮৫.৩৯ শতাংশ (পুরুষ - ৮৯.৬ শতাংশ মহিলা - ৮০.৮৭ শতাংশ)। পঞ্চায়েত আসন - ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯।

সূত্র : Census - 2011. Village code - 322707

☐ ইছাপুরের জমিদারদের বংশ তালিকা

ধৃতি (কান্যকুব্জবাসী) → দক্ষ [আদিশূর রাজার (কালীপুর) যজ্ঞে আনীত] → কাকুৎস্থ (হাড়ো গ্রামবাসী) → হলভিনাস → শ্রীমান → শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য → শঙ্কুরাম → পশুপতি → জনার্দন (বল্লাল সেন কর্তৃক গৌণ কুলীন আখ্যা পান) → X X X → X X X (এই দুই পুরুষের নাম জানা যায়নি) → শ্রীকর রাঘব → কমল → নীলকণ্ঠ ঠাকুর → প্রজাপতি → জগদীশ তর্কাচার্য → রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ (মোগল বাদশা আকবর কর্তৃক ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে চৌধুরি আখ্যা পান) → রামচন্দ্র সার্বভৌম → রঘুনাথ চক্রবর্তী চতুর্ধুরীণ → মধুসূদন (৩য় পুত্র) → রামদেব → রামজীবন (*গোবিন্দদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠাতা)

রামজীবন (*গোবিন্দদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠাতা)
কৃষ্ণরাম
বিষ্ণুরাম
রামগোপাল (পেনুর মা)
মুলুকচাঁদ
দুর্গাচরণ
গোরাচাঁদ
গঙ্গাধর
রামরতন
শিবচন্দ্র
রুদ্র
প্রভাত
(নিঃসন্তান ও মৃত)
ভুবনমোহন
৮ পুত্র ও ১ কন্যা
হরিচরণ
সরসী
অমূল্যচরণ
অপূর্বচরণ
অরবিন্দপ্রকাশ
অনিমেষ
অপর্ণা
অন্নপূর্ণা
অর্চনা
অরুণা
অপরেশ
অমলেশ
অমিতা
অখিলেশ
অসিমা
অশোক
অনীতা
অভিজিৎ
অনুজিৎ
অরুণেশ
তনুশ্রী
অলকেশ
অরূপেশ
অমরেশ
অনিলেশ
অনীশ

□ পরিশিষ্ট : নবঠাকুরের (রামচরণ চৌধুরি) বংশ
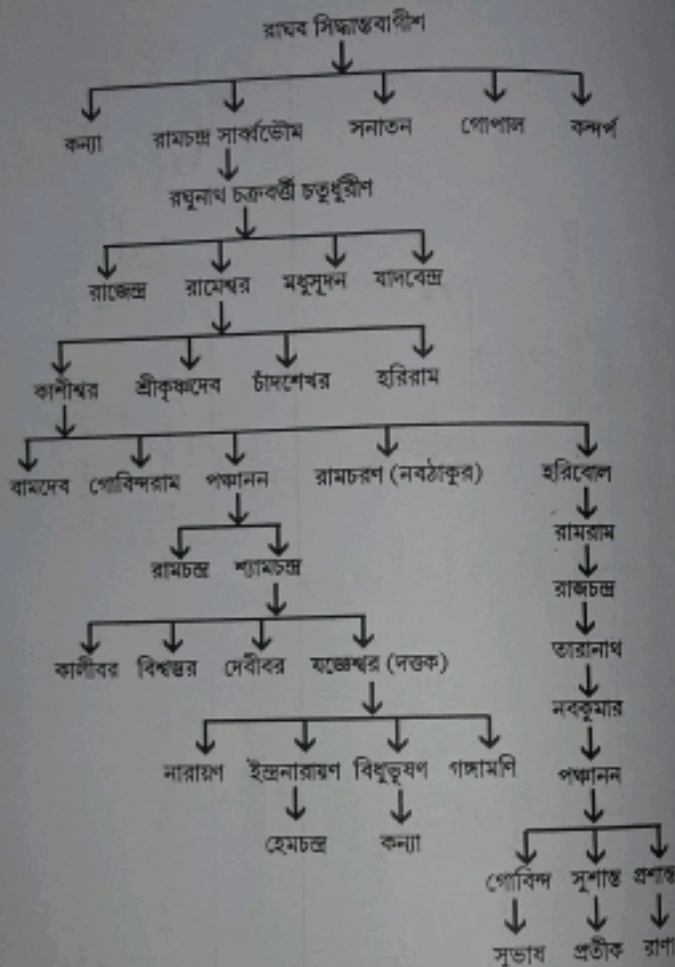
(সূত্র : গোবরডাঙা ইছাপুরের চৌধুরি বংশ ও গোবিন্দদেব — শ্রীঅনিমেষ চৌধুরী)

❑ ইছাপুরের জনপ্রতিনিধি

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা :

১৯৫২ - ১৯৬০ : ডাঃ মন্মথনাথ ঘোষ, গণেশ চ্যাটার্জি, পঞ্চানন চৌধুরি (এঁরা ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হন। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাছাই করে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য করা হত। কোন প্রকার নির্বাচন হত না।

১৯৬০ সালে প্রথম পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা চালু হয়। এটি ছিল দ্বি-স্তর বিশিষ্ট, গ্রামসভা এবং অঞ্চলসভা বা অঞ্চল পঞ্চায়েত। গ্রামসভার প্রধানকে অধ্যক্ষ ও অঞ্চলসভার প্রধানকে বলা হত অঞ্চল প্রধান।

ইছাপুর অঞ্চল তখন ১৮টি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২৬ জন।

১৯৬০ - ১৯৭৭ : ইছাপুর গ্রামসভার প্রথম নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কমল চক্রবর্তী (কালী চক্রবর্তী), তারকনাথ ঘোষ, হাবু মোড়ল, শরৎচন্দ্র পাল, জামাতালি মণ্ডল, অমূল্য বিশ্বাস, অমূল্য পাল, কালীপদ পাল, চণ্ডীপদ মিত্র, দেবব্রত কর চৌধুরি, সুরেন দে প্রমুখ এবং প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ।

প্রথম অঞ্চলপ্রধান হন ফকির আহমেদ (কয়া) এবং উপপ্রধান হন ধীরানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় ফকির আহমেদ দাঙ্গাকারীদের হাতে নিহত হওয়ায় অঞ্চলপ্রধান হন সুরেন হালদার (ঠাকুরনগর) এবং উপপ্রধান হন দুলাল মণ্ডল (জামদানি)।

১৯৭৭ অবধি এঁরাই কাজ চালান কারণ আর কোনো নির্বাচন হয়নি। ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়। ইছাপুর অঞ্চল ১ ও ২ নং - এ ভাগ হয়। ১নং অঞ্চলে ৮টি মৌজা ও ৯টি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৭৮ - ১৯৮৩ : ১৯৭৮ সালে নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে ইছাপুর গ্রাম থেকে নির্বাচিত হন বিশ্বনাথ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ পাল ও দুলাল ভট্টাচার্য। প্রথম প্রধান হন নিতাই ঘোষ ও উপপ্রধান হন সুশীল হাজরা।

পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন আকুলানন্দ দাস।

১৯৮৩ - ১৯৮৮ : ১৯৮৩ - এর দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইছাপুর গ্রাম থেকে নির্বাচিত হন বিশ্বনাথ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও দুলাল নাগ। প্রধান হন নিতাই ঘোষ ও উপপ্রধান হন বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন অমল সরকার।

১৯৮৮ - ১৯৯৩ : ১৯৮৮ সালে তৃতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় গ্রামে সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ৪ জন। এই সময় গ্রাম থেকে নির্বাচিতেরা হলেন বিশ্বনাথ ঘোষ বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিবেকানন্দ ঘোষ (নেলো), দুলাল নাগ। পঞ্চায়েত প্রধান হন বিশ্বনাথ ঘোষ, উপপ্রধান হন আশুতোষ ঘোষ।

পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন অমল সরকার।

১৯৯৩ - ১৯৯৮ : ১৯৯৩ সালে চতুর্থ পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম থেকে নির্বাচিত হন বিশ্বনাথ ঘোষ, শিবেন দত্ত, দুলাল নাগ ও মীরা চক্রবর্তী (প্রথম মহিলা প্রতিনিধি)। প্রধান হন নির্মল দে ও উপপ্রধান শিবেন দত্ত।

পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন অমল সরকার।

১৯৯৮ - ২০০৩ : ১৯৯৮ সালে পঞ্চম পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম থেকে নির্বাচিত হন মমতা ঘোষ, গোষ্ঠ বিশ্বাস, দুলাল নাগ ও সুশীল পাল। প্রধান হন পূর্ণিমা দালাল ও উপপ্রধান হন শ্যাম বিশ্বাস।

পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন ভারতী ঘোষ।

২০০৩ - ২০০৮ : ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত হন কেনারাম ঘোষ, ধীরেন পাল, সুশীল পাল, সবিতাকর চৌধুরি। প্রধান হন রমেশ দেউরী ও উপপ্রধান হন ধীরেন পাল।

পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন দেবু ভট্টাচার্য।

২০০৮ - ২০১৩ : ২০০৮ সালে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হন দুলাল নাগ, সমর বিশ্বাস, ধীরেন পাল, দেবদাস দাস। পঞ্চায়েত প্রধান হন দুলাল নাগ।

পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন বিশ্বনাথ ঘোষ।

২০১৩ - ২০১৮ : ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত হন কেনারাম ঘোষ, তপন পাল, রমা দাস, কাকলি দাস। প্রধান হন তরুণ বৈরাগী ও উপপ্রধান হন শুক্লা সরকার।

পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হন বিশ্বনাথ ঘোষ।

এছাড়াও ১৯৬৭ সালে ইছাপুর গ্রামের কৃতিছাত্র ও শিক্ষক চণ্ডীপদ মিত্র বাংলা কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। পরে ইনি দলত্যাগ করে পি. ডি. এফ. মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং সমবায় ও পর্যটন রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ১৯৭১ - এ তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। অল্প কিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মীরা মিত্র নির্বাচিত হন।

(সূত্র : ইছাপুরের ইতিকথা ও অধীর ঘোষ)

□ ইছাপুর বিষয়ক পুস্তক ও পত্র - পত্রিকাবলী

১। ইছাপুরের ইতিকথা — স্বপন কুমার বিশ্বাস। প্রকাশকাল — বৈশাখ, ১৪১৫। মূল্য -১৫০ টাকা, উতল হাওয়া প্রকাশনী, ২৩১ পৃষ্ঠা ও ৩২ পৃষ্ঠা ছবি।

২। যমুনা - ইছামতীর তীরে তীরে — স্বপন কুমার বিশ্বাস। প্রকাশকাল — ২০১৬, মূল্য - ২০০ টাকা, প্রকাশক - বেস্ট ফ্রেন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা ও ৪৮ পৃষ্ঠা ছবি।

৩। গোবরডাঙা ইছাপুরের চৌধুরী বংশ ও গোবিন্দ দেব — অনিমেষ চৌধুরী, প্রকাশক - শুভেন্দু সুন্দর মুখোপাধ্যায়, ২৮ পৃষ্ঠা, প্রকাশকাল — ২/১১/২০০৩।

৪। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (৩য় খণ্ড)। সম্পাদনা — অশোক মিত্র। এই গ্রন্থের ১৪-১৭ পৃষ্ঠায় ইছাপুরের পূজা ও মেলা বিষয়ে তথ্য আছে। প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ (Volume 16, part - 78, West Bengal)

৫। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড) — বিনয় ঘোষ। এই গ্রন্থে ইছাপুর মাটিকোমড়া - গোবরডাঙা বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান নিবন্ধ আছে।

৬। বাংলায় ভ্রমণ (১ম খণ্ড), প্রকাশক — পূর্ব রেলওয়ে। এই গ্রন্থে ইছাপুরের (নবরত্ন মন্দিরের ছবি সহ) সম্পর্কে তথ্য আছে।

৭। যশোহর-খুলনার ইতিহাস — (দুই খণ্ড) - সতীশ চন্দ্র মিত্র। প্রথম প্রকাশ — প্রথম খণ্ড - ১৯১৪, দ্বিতীয় খণ্ড - ১৯২২।

৮। খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী — বিপিনবিহারী চক্রবর্তী ও দুর্গাচরণ রক্ষিত। প্রথম প্রকাশ - ১৩০৮ (১৯০২), ৩ টাকা, ৩৬০ পৃষ্ঠা। ২০১০ সালে গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট বইটির পুনর্মুদ্রণ করে। ২৫২ পৃষ্ঠা, ২০০ টাকা।

৯। ফিরে দেখা — দুলাল ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল — ১৪২০ (২০১৩), ইছাপুর ফ্রেন্ডস ক্লাব। ১০০ টাকা, ১৪৩ পৃষ্ঠা ও ৩০ পৃষ্ঠা ছবি।

১০। স্ফুরণ — ইছাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের (উ.মা.) পত্রিকা। এর বিভিন্ন সংখ্যাগুলি থেকে ইছাপুরে শিক্ষা বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। (২০১৩ সংখ্যাটি বিশেষভাবে সংগ্রহযোগ্য)।

১১। গোবরডাঙা খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদহ প্রসঙ্গ — সম্পাদনা - ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ - ২০১৫, মূল্য - ৪০০ টাকা, ৪২৮ পৃষ্ঠা।

১২। স্মারক — ইছাপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ। সম্পাদনা — আনন্দ চক্রবর্তী।

১৩। কুশদহ বার্তা — প্রথমে কুশদহ (নবপর্যায়) নামে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৯২ সালে 'কুশদহ বার্তা' নামটি রেজিস্ট্রিকৃত (RNI - 53006/92) হয়ে এই নামেই পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকাশক — গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট। এর বিভিন্ন সংখ্যায় ইছাপুর সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।

১৪। ইতিহাসের জনগ্রাম — নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে ইছাপুর সম্বন্ধে তথ্য আছে। ২৪০ পৃষ্ঠা ও ৬ পৃষ্ঠা ছবি, নতুন সংস্করণ ২০১৭, মূল্য - ২০০ টাকা।

১৫। ইতিহাসের আলোকে যশোর - খুলনার পাঁচশো বছর — শশধর চক্রবর্তী। চক্রবর্তী প্রকাশন থেকে ১৪০০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশ হয়। ৫৭০ পৃষ্ঠা (দুই খণ্ড একত্রে)।

১৬। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত — কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। এই গ্রন্থে কুশদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে।

১৭। মন্মথনাথ ঘোষ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তিতে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ।

১৮। কুশদহের ইতিহাস — হাসিরাশি দেবী। প্রকাশক - শ্রী দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬বি নন্দলাল বোস লেন। কলিকাতা - ৩। প্রাপ্তিস্থান - ইমপ্রেসিভ, কলি - ৬। ১৯৬৮। ৪ টাকা, ১৮৮পৃষ্ঠা।

১৯। কুশদহের ইতিহাস — চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কুশদহ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কুশদহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি এখানে আছে। যদিও এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

২০। কুশদহ — মাসিক পত্রিকা (১৩১৫ - ১৩২৫)। সম্পাদক — দাস যোগীন্দ্রনাথ কুন্ডু।

২১। গোবরডাঙা — সম্পাদক - মণি দাশগুপ্ত। এই পত্রিকায় ইছাপুর সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

২২। পুরাতনী — উত্তর ২৪ পরগনা ইতিহাস পরিষদের মুখপত্র। সম্পাদক — কুমারেশ দাস, প্রকাশক -বিজয় দেবনাথ। এই পত্রিকার ভাদ্র ১৪১৮ বঙ্গাব্দের সংখ্যাটিতে ইছাপুরের নবরত্ন মন্দির ও প্রাচীন কালের সংস্কারপন্থী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

২৩। উত্তরী — শারদীয়া সংখ্যা। ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, আশ্বিন ১৪২১, এই পত্রিকায় বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধটি ইছাপুর বিষয়ে আলোকপাত করে। (ক্রমশ)

সংবাদ

যমুনা - বর্তমানে হারিয়ে যেতে চলেছে

গাইঘাটা, ঠাকুরনগর, চাঁদপাড়া, ইছাপুর, সৈপুর, গোবরডাঙা ও সন্নিহিত অঞ্চলের জীবনযাত্রা, কৃষিকাজ, জলনিকাশি ব্যবস্থায় যমুনা নদীর ভূমিকা জীবন গুরুত্বপূর্ণ। জনজীবনের নানা ভুল পদক্ষেপ ও প্রশাসনিক অবহেলায় নদীটি ক্রমশ হারিয়ে যেতে চলেছে। গতিপ্রবাহ হারিয়ে নদীটি মৃতপ্রায়। যমুনার বেশিরভাগ জায়গাই দখল হয়ে গিয়েছে। চাষ আবাদ হচ্ছে, মাছের ভেড়ি তৈরি হয়েছে। ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ইছাপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের 'লাইফ লাইন' যমুনাকে বাঁচানো আমাদের আশু কর্তব্য। আসুন আমরা সবাই মিলে যমুনাকে বাঁচাই।

কবিতা

বিকেলের রোদ্দুর

(কবি অনুপ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি)

কৌশিক মজুমদার

এখনও বিকেল, রোদ্দুর সাজিয়েছে বারান্দায়
তোমার মাথার উপর উড়ছে বিকেলের ঘুড়ি
এখনও তোমার মেধায় ভেসে আসছে সুদূর সংকেত,
তোমাকে খুব পোড়ায় একটি কবিতার তাগিদ।

আমি দেখেছি, তোমার নীরব একাকিত্ব রঙিন উৎসবে
একাই নিজেই নিজের আকাশের বুকে
যেমন খুশি তারাদের রেখেছ সাজিয়ে
ভালোবাসার শব্দ জড়িয়ে রেখেছ পৈতের সুতোয়।

তবু কোনদিন নিজেকে মেলে ধরনি একটিবার
যখনই তোমার মহিমারা আঙুল ছুঁতে চেয়েছে
তুমি তখন দেখছি দেখছি করে এড়িয়ে গেলে
আজ দেখছি দেখছি করে দেখার মুহূর্তটাই শেষের পথে।

★ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মতামতের
দায় সংশ্লিষ্ট লেখকের ★

ICHAPUR BARTA (SOCIO AND CULTURAL MAGAZINE), MOUTH PIECE OF ICHAPUR VILLAGE, EDITED BY - BIPLAB GHOSH PUBLISHED BY SRI SATADAL GHOSH, ON BEHALF OF DIPANWITA PRAKASHANI, ICHAPUR, GOBARDANGA, VOL. - 1, ISSURE - 1, FIRST ISSUE AND PUJA NUMBER. CONTACT - 9093613175.

'আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করি, যাহার যতদূর সাধ্য সে ততদূর করুক।' — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইছাপুর বার্তা (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাময়িকী) — বিপ্লব ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রী শতদল ঘোষ কর্তৃক দীপান্বিতা প্রকাশনী ইছাপুর থেকে প্রকাশিত।

যোগাযোগ — চলভাষ - ৯০৯৩৬১৩১৭৫

ইমেল - biplabghosh2028@gmail.com

বর্ণ সংস্থাপনায় - গদাধর রাহা। মোঃ - ৯৮৫১৫৩১৮৭৬ / ৯৫৬৪১৭৭১৭০